সমরেশ মজুমদার

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি[illegible]

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৫৮ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
অলংকরণ
রুচিরা মজুমদার
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রো
হাওড়া-৪
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
কলেজ রো
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীললিতমোহন পান
লক্ষ্মী জনার্দন প্রিন্টার্স
২৬/২এ সিমলা রোড
কলকাতা-৬।

এই বিশ্বের কিশোর গোষ্ঠীকে

লেখকের অন্য বই

বাছাই গল্প
তেরো পার্বণ
আকাশ পাতাল
না আকাশ না পাতাল
শয়তানের চোখ
টাকা পয়সা
সওয়ার
তীর্থযাত্রী
উত্তরাধিকার
কালবেলা

ইতিহাসের চরিত্র কালাপাহাড় সম্পর্কে পণ্ডিতরা বিশদ কিছু লিখে যাননি। কিন্তু সেই মানুষটি যে খুব ভয়ংকর ছিলেন, মন্দির ভাঙতেন এমন কথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে চালু আছে। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু তাঁর জীবনী নয়। তাঁর সেই ভয়ংকর ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে আর এক ধরনের রহস্যের জাল বোনা হয়েছিল এই সেদিন। তাই 'কালাপাহাড়' শুধুই রহস্য উপন্যাস।

সমরেশ মজুমদার

১
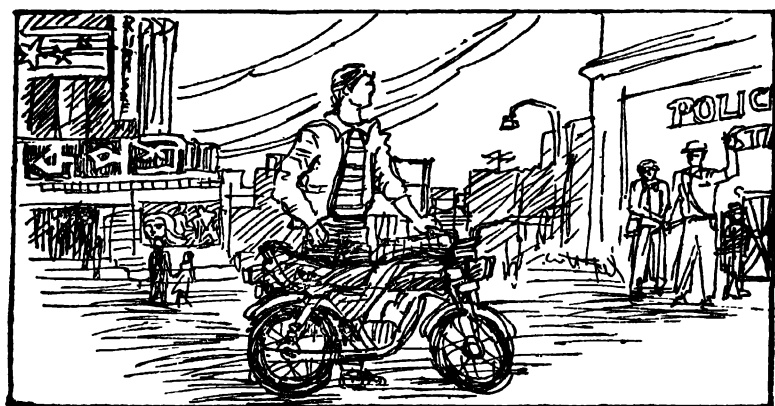
লাল রঙের নতুন মোটরবাইকটাকে ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের অনেকেই চিনে গিয়েছে। শহরের সবাই জানে রোজ সকাল আটটায় বাইকটা কদমতলা থেকে রূপশ্রী সিনেমার সামনে দিয়ে থানাটাকে বাঁ দিকে রেখে একটু এগিয়েই বাঁ দিকে করলার ধার ঘেঁষে হাকিম-পাড়ার দিকে চলে যাবে। কেউ-কেউ তো ওই যাওয়া দেখেই বুঝে নেয় এখন আটটা বাজে। মোটরবাইকটা চালাতে খুব আরাম পায় অর্জুন।

বাইকটা উপহার দিয়েছেন নন্দিনীর বাবা দিল্লির মিস্টার রায়। সেই যে নন্দিনীরা চার বন্ধু মিলে নর্থবেঙ্গলে বেড়াতে এসে ঝামেলায় পড়েছিল, তা থেকে উদ্ধার করেছিল বলে তিনি ওই উপহারটি দিয়েছেন। অবশ্যই উপহারটি এসেছিল অমলদার মারফত।

প্রত্যেক সকালে লাল বাইক চালিয়ে অমল সোমের বাড়িতে যাওয়া

অভ্যেস অর্জুনের। সেখানে গিয়ে বইপত্তর ঘাঁটে, হাবুর দেওয়া চা খায়। কখনও-সখনও মেজাজ ভালো থাকলে অমলদা গল্প করেন। সত্যসন্ধানের ব্যাপারে তিনি এখন খুব সক্রিয় ভূমিকা নেন না বটে, তবে থানার নতুন দারোগা শ্রীকান্ত বক্সি সমস্যায় পড়লেই ওঁর কাছে ছোটেন।

আজ রূপশ্রী পেরিয়ে থানার সামনে আসতেই অর্জুন দেখলো থানার গেটের সামনে শ্রীকান্ত বক্সি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। পাশেই নীল রঙের অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখতে পেয়েই দারোগাবাবু হাত তুললেন, "তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি হে।"

অর্জুন গতি থামালো।

শ্রীকান্ত বক্সি এগিয়ে এলেন, "আমাকে এখনই একটু বেলাকোবায় যেতে হবে। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হরিপদ সেন। আমার কাছে এসেছিলেন অমলবাবুর ঠিকানার জন্য। থাকেন দমদম এয়ারপোর্টের কাছে। এর নাম হলো অর্জুন। আমাদের শহরের গৌরব ও। অনেক রহস্য উদ্ধার করেছে। অমলবাবুর শিষ্য।"

অর্জুন নমস্কার করতেই ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করলেন। অর্জুন বললো, "ওই গাড়িটা কি আপনার?"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "না, শিলিগুড়ি থেকে ভাড়া করেছি।"

"ও। আপনি ড্রাইভারকে বলুন আমাকে ফলো করতে।"

করলা নদীর ধার দিয়ে যেতে-যেতে পেছনে তাকিয়ে সে দেখলো, গাড়িটা ঠিকঠাক আসছে। একেবারে কলকাতা থেকে কোনোও ক্লায়েন্ট অমলদার খোঁজে আসছে মানে কেউ ওঁকে আসতে বলেছেন। অমলদা নিজে সক্রিয় ভূমিকা নেন না যখন, তখন তাকেই কাজটা করতে হবে। কী ধরনের কাজ তা আন্দাজে না এলেও বেশ উত্তেজনা বোধ করছিলো সে। কলকাতায় যেতে হবে নাকি এ-ব্যাপারে?

অমল সোমের বাড়ির গেটে বাইক থামিয়ে সে হাত তুললো। গেট খুলে বাইকটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে দেখলো ভদ্রলোক গাড়ি

থেকে নেমে পড়েছেন। সে বললো, "এটাই অমলদার বাড়ি। আসুন আমার সঙ্গে।"

একটু এগোতেই হাবুকে দেখতে পাওয়া গেল বাগানে। মরা পাতা ছাঁটছে। ইশারায় অমলদাকে খবর দিতে বলতেই দাঁত বের করে দেখিয়ে হাবু ভেতরে চলে গেল। বসার ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় উঠে অর্জুন ভদ্রলোককে বললো, "আপনি একটু ভেতরে বসুন।"

ভদ্রলোক বললেন, "বাঃ, বেশ বড়-বড় ফুল হয়েছে তো!"

অর্জুন হাসল, "এ-সবই হাবুর কৃতিত্ব। ওর জিভ কথা বলতে পারে না কিন্তু হাত কথা বলে।"

"হাত কথা বলে?" হরিপদ সেন মাথা নাড়লেন, "চমৎকার বললেন ভাই।"

হরিপদ সেনের বয়স ষাটের ধারেই। একটু অস্বস্তি হলেও আপনি বলার জন্য এখনই আপত্তি করলো না অর্জুন। কাজ করতে গিয়ে নানান মানুষের সংস্পর্শে এসে এটুকু পরিবর্তন হয়েছে। সে হরিপদ সেনের চেহারাটা দেখলো। হাওয়াই শার্ট-প্যান্ট-চশমায় বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা। পায়ে বেশ দামি জুতো। শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করে রেখেছেন, মানে পকেটে ভালো টাকা আছে। লোকটার আঙুলে কোনোও আংটি নেই। চেয়ারে বসার পর বোঝা গেল ডান হাতের কড়ে আঙুল অনেকখানি বাঁকা। ইনি কী করেন তা সে আন্দাজ করতে পারল না।

"আপনি এদিকে এর আগে এসেছেন?" অর্জুন সময় কাটানোর জন্য প্রশ্ন করলো।

"অনেকবার।" ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না।

বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজ পাওয়া গেল। ইদানীং অমলদার খুব পছন্দ ওই চটি। ভেতরের দরজায় শব্দটা থাকতেই অমলদাকে দেখা গেল।। ঝুল ফতুয়া আর পাজামা পরা। দেখা হওয়ামাত্র বললেন,

„ওহে অর্জুন, তোমার-আমার জন্য একটা ভালো খবর আছে।” তার-পরেই হরিপদবাবুর ওপর নজর যাওয়া মাত্রই দুটো হাত জোড় করে বললেন, “নমস্কার। আমি অমল। আমার বাড়িতে আপনি এসেছেন, আগে আপনার সঙ্গেই কথা বলা উচিত ছিল। বসুন, বসুন।” বলতে-বলতে একটি চেয়ার টেনে নিলেন তিনি। হরিপদবাবু মৃদু হেসে বললেন, “আমি আপনার নাম শুনেছি আমাদের প্রোফেসর বনবিহারী ভট্টাচার্যের কাছে। একটি অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনের সাহায্যের আশায় আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমি।”

অর্জুন বললো, “থানার সামনে শ্রীকান্তবাবু ওঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।” অর্জুন আলাপ করিয়ে দিলো।

“শ্রীকান্তকে আগেই চিনতেন?” অমলদা জিজ্ঞেস করলেন।

“না, না। আপনি জলপাইগুড়িতে আছেন এইটুকুই জেনেছিলাম। ভাবলাম, থানায় গেলে নিশ্চয়ই আপনার ঠিকানাটা জানা যাবে।”

হরিপদবাবু দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

“আপনার সমস্যাটা কী?” খুবই অনাগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলেন অমলদা।

“একটি মানুষের গতিবিধি বের করতে হবে আপনাকে।”

“ওঃ, সরি। এজন্য কলকাতা থেকে এতদূরে এলেন কেন? কলকাতায় অনেক এজেন্সি আছে, যাদের বললে সাগ্রহে করে দেবে।” অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন।

“আপনি একটু শুনুন মিস্টার সোম। আমি জানি প্রস্তাবটা খুবই হাস্যকর শোনাবে, কিন্তু উপায় নেই। সাধারণ ডিটেকটিভ এজেন্সির পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়। প্রফেসর বনবিহারী আমাকে বললেন আপনিই ঠিক মানুষ। আমি যাঁর গতিবিধি জানতে চাই তিনি এখনকার মানুষ নন। তিনি ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান।”

“অদ্ভুত। ইন্টারেস্টিং।” অমল সোম বসে পড়লেন আবার, “এতদিন জীবিত মানুষ নিয়ে কাজ করেছি! মৃত মানুষ, তাও আবার চারশো দশ বছর আগে মৃত মানুষের কেস নিয়ে কেউ আসবেন ভাবতে

পারিনি। মানুষটির নাম কি আমরা জানি ?"

"জানা স্বাভাবিক। অন্তত ইতিহাসের বইয়ে দু-চার লাইন প্রত্যেকেই একসময় পড়েছি। ওঁর নাম যাই হোক, ইতিহাস ওঁকে কালাপাহাড় নামে কুখ্যাত করেছে।"

"কালাপাহাড় !" অমলদাকে এমন বিস্মিত হতে অর্জুন এর আগে কখনও দেখেনি।

হরিপদ সেন কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় হাবু এল চায়ের ট্রে নিয়ে। সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ির সূর্য বেকারির তৈরি সুজির বিস্কুট। দামি কম্পানির বিস্কুটে আজকাল মন ভরছে না অমলদার। অর্জুন জানে এই বিস্কুট মাসখানেক এ-বাড়িতে চলবে। কিন্তু চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেও সে হরিপদ সেনকে অবাক হয়ে দেখছিল। কালাপাহাড় লোকটি সম্পর্কে সে ইতিহাসে যা পড়েছে তাতে ভয়ই হয়। ওঁর নামকরণেই সেটা বোঝা যায়। এমন একটি মানুষের গতিবিধি জানতে চারশো বছর পর কেউ উৎসুক হবেন কেন ?

অমলদার জন্য চা আসেনি। তিনি এ-সময় চা খান না। বললেন, "মিস্টার সেন, আপনি কি কলেজে-টলেজে ইতিহাস নিয়ে পড়াচ্ছেন ?"

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, "না, না। আমার একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে।" চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "চমৎকার চা। দার্জিলিং-এর ?"

অমলদা হাসলেন, "না। এটা ডুয়ার্স অসম দার্জিলিং মিলিয়ে একটা ককটেল।"

হরিপদবাবু নিবিষ্ট মনে কয়েক চুমুক দিয়ে বকলেন, "কালাপাহাড় এ-অঞ্চলে দীর্ঘকাল ছিলেন। ইতিহাস বলছে লোকটি অত্যন্ত ভয়ানক। কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে তিনি খুবই নিঃসঙ্গ ছিলেন। এই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, তখন অবশ্য জেলা হিসেবে চিহ্নিত ছিল না, উনি ঘোরাফেরা করেছেন। কিন্তু কোথায়-কোথায় ছিলেন এই ডিটেলস পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা যদি সেটা বের

করে দেন··· ।”
“কেন ?” আচমকা প্রশ্নটি বেরিয়ে এলো অর্জুনের মুখ থেকে।
অমলদা মাথা নাড়লেন, “গুড। এই প্রশ্নটি আসা খুবই স্বাভাবিক। কেন আপনি এই ঐতিহাসিক চরিত্রটির সম্পর্কে এত আগ্রহী ? আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র ?”
হরিপদ সেন একটু ইতস্তত করলেন, “আজ্ঞে না। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। আগ্রহী হওয়ার একটা কারণ ঘটেছে। আমার ঠাকুর্দার ভাই বিয়ে-থা করেননি। তিনি থাকতেন পুরীতে। একাই। প্রায় নব্বুই বছর বয়স। আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। শেষবার পুরীতে গিয়েছিলেন বছর পনেরো আগে। হঠাৎ মাস তিনেক আগে তিনি লেখেন আমাকে সেখানে যেতে। বিশেষ দরকার। গিয়েছিলাম। দেখলাম উনি খুবই অশক্ত হয়ে পড়েছেন। মনে-মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। উনি আমাকে কিছু কাগজপত্র দিলেন। এই কাগজগুলো প্রায় দুশো বছর আগে ওঁর প্রপিতামহ লিখেছিলেন। ইনি যক্ষের মতো সব আগলে রেখেছিলেন। আমায় বললেন, ইচ্ছে হলে হদিস করতে পারিস।”
“কিসের হদিস ?”
“কাগজপত্র দেখলে আপনি বুঝবেন ব্যাপারটা। সংক্ষেপে যেটুকু জেনেছি, বলি। আমরা আসলে কর্ণাটকের মানুষ। পাল যুগে আমাদের কোনোও পূর্বপুরুষ আরও অনেকের সঙ্গে গৌড়ভূমিতে আসেন। তাঁরা যুদ্ধ করতে জানতেন, ফলে পালরাজাদের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতে অসুবিধে হয়নি। আপনারা নিশ্চয়ই সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন, বিজয় সেনের নাম শুনেছেন, যাঁরা সেনসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের উত্তরাধিকারী হলেন বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন। আমার পূর্বপুরুষরা এঁদের রাজত্বে ভালো মর্যাদায় ছিলের। তারপর মুহম্মদ বকতিয়ার খিলজি এলেন, মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলেও আমার পূর্বপুরুষরা রাজকর্মচারীর পদ হারালেন না। সুলেমান কিরানি

এবং তার ছেলে দাউদের সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। ইনি যখন পুরী আক্রমণ করেন তখন আমার এক পূর্বপুরুষ তাঁর অনুগামী হন। কিন্তু সেখানে কালাপাহাড়ের আচরণে সন্তুষ্ট না হয়ে সৈন্য-বাহিনী ত্যাগ করে পুরীতেই থেকে যান। পরে আমার ঠাকুর্দা ফিরে এসেছিলেন বাংলাদেশে কিন্তু তাঁর ভাই থেকে গিয়েছিলেন। মোটা-মুটি এই হলো বৃত্তান্ত।"

"খুবই ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এত তথ্য কি ওই কাগজপত্রে পেয়েছেন আপনি?"

"না। কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার যে পূর্বপুরুষ পুরীতে অভিযান করেছিলেন তাঁর নাম নন্দলাল সেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা লেখা আছে। পরে আমি কিছুটা ছোট ঠাকুর্দার কাছে, কিছুটা ইতিহাস বই ঘেঁটে, আবার প্রোফেসর ভট্টাচার্যের কাছে শুনে এইটে খাড়া করেছি।" হরিপদ সেন রুমালে মুখ মুছলেন। এই না-গরম আব-হাওয়াতে ওঁর ঘাম হচ্ছিল।

অমল সোম বললেন, "আপনার বংশেব ইতিহাস শুনলাম। কিন্তু আপনি কেন কালাপাহাড় সম্পর্কে এতটা আগ্রহী তা বোধগম্য হচ্ছে না।"

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে উসখুস করতে লাগলেন।

অমল সোম বললেন, "দেখুন। আমি এখন সাধারণ কেস নিই না। ভালো লাগে না। যা করার অর্জুনই করে। কিন্তু এটিকে সাধারণ বলা যায় না। আপনাকে সাহায্য করতে পারি যদি আপনি কোনোও কথা গোপন না করেন!"

"আমি জানি, জানি।" ভদ্রলোক রুমাল পকেটে ঢোকালেন, "আসলে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। প্রথমত, তথ্যটা ভুল হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আর কেউ জানুক সেটা আমি চাইছি না। ভুল হলেও নয়। বুঝতে পারছেন?"

অমলদা বললেন, "ডাক্তারকে কোনোও রুগী রোগের কথা বললে তিনি

তা পাঁচজনকে বলে বেড়ান না। আপনি যদি ভাবেন অর্ধেক জেনে কাজ করবো তা হলে ভুল ভেবেছেন।"

হরিপদ সেন বললেন, "ইয়ে, ছোট ঠাকুর্দার প্রপিতামহ লিখেছেন, নন্দলাল সেন কালাপাহাড়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ এবং অসমে অভিযান করেছিলেন। এই সময় অজস্র সোনা কালাপাহাড় মাটির তলায় গোপনে সরিয়ে রাখেন। তাঁর নবাবও কিন্তু এই খবর জানতেন না। নন্দলাল মনে করতেন সেই সোনার একটা অংশ তাঁর পাওনা। কালাপাহাড় তাঁকে সেটা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে সেই সোনা উদ্ধার করা কালাপাহাড়ের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। নন্দলালের মুখ থেকে তাঁর পুত্র-পৌত্ররা যা শুনে এসেছে তা হলো, কালাপাহাড় যেখানে সোনা রেখেছিলেন তার চারপাশে প্রায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল, একটা বিশাল বিল আর শিবমন্দির ছিল। জায়গাটা উত্তরবঙ্গ অথবা অসমে। অসমে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ তখন তারা পুরীর দিকে যাত্রা করেছিলেন। মিস্টার সোম, আমি নন্দলাল সেনের উত্তরাধিকারী। ওই সোনার একটা অংশের ওপর আমার অধিকার আছে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?"

"পারছি। কিন্তু আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন কালাপাহাড়ের এ অঞ্চলের গতিবিধির খবর জোগাড় করে দিতে। সোনা খুঁজে দিতে নয়।"

"না, না। এটা আমি আপনাকে বলতাম।" তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন হরিপদ সেন।

অমল সোম হাসলেন, "আপনি বুনো হাঁসের খোঁজে আমাকে ছুটতে বলছেন?"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই। আবার তাও নয়।"

"নয় মানে?"

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে এর পেছনে সত্যতা আছে।"

"কীরকম?"

হরিপদ সেন পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। সেটা এগিয়ে দিলেন অমল সোমের দিকে। অমল সোম কাগজটি খুলে চোখ রাখলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে কৌতুক ফুটে উঠলো, "এটি কবে পেয়েছেন ?"

"গত সপ্তাহে। তারপরেই প্রোফেসর আমাকে বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

"আপনার এই তথ্য আর কে কে জানেন ?"

"কেউ না। আমার ছোট ঠাকুর্দা আর আমি। পূর্বপুরুষরা যাঁরা জানতেন, তাঁরা অনেককাল আগে দেহ রেখেছেন।"

"আপনার বাবা জানতেন না ?"

"না। জানলেও আমাকে বলেননি। তা ছাড়া আমার ঠাকুর্দা অল্প-বয়সেই চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন বলে বাবার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।"

"কিন্তু কেউ একজন জানেন, এটি তার প্রমাণ।"

"হ্যাঁ।"

"আপনার ঠাকুর্দা, আই মিন ছোট ঠাকুর্দা, এখন কেমন আছেন ?"

হরিপদ সেন মাথা নাড়লেন, "আমি চলে আসার দিন দশেক বাদে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে উনি মারা গিয়েছেন।"

"স্নান করতে গিয়ে মারা গেছেন ? উনি সমুদ্রস্নান করতেন ওই বয়সে ?"

"না। ভালো করে হাঁটতেও পারতেন না। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন উনি নিষেধ করেছিলেন সমুদ্রে স্নান করতে। বলেছিলেন জলে খুব ভয় ওঁর। চৈতন্যদেবের উচিত হয়নি জলের কাছে যাওয়া।"

"চৈতন্যদেব ?"

"ঠাকুর্দা চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন।"

"ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে যাননি কেন ?"

"আমি পুরী থেকে ফিরেই চণ্ডীগড় গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে।

বাড়ির লোক ঠিকানা জানতো না। ফিরেছিলাম দিন কুড়ি বাদে। তখন গিয়ে কোনোও লাভ হতো না।"

"আপনাদের পুরীর বাড়ির কী অবস্থা? নিজস্ব বাড়ি নিশ্চয়ই!"

"তালাবন্ধ আছে। যে ঠাকুর্দাকে দেখাশোনা করতো সে জানিয়েছে।"

"এই চিঠি পোস্টে এসেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মিস্টার সোম, আপনি একটু সাহায্য করুন। যদিও চারশো বছরের বেশি সময় চলে গিয়েছে, কিন্তু সোনায় তো জং পড়ে না।"

"আপনার ব্যবসার অবস্থা কেমন মিস্টার সেন?"

"খুব ভালো নয়।"

"আপনি আজকের রাতটা এখানকার হোটেলে থাকুন। থানার কাছে 'রুবি বোর্ডিং' নামে একটা সাধারণ হোটেল পাবেন। কাল সকালে আসুন। আমি ভেবে দেখি।"

হরিপদ সেনের মুখে হাসি ফুটলো, "আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। শিলিগুড়ির 'দিল্লি হোটেল' আমার পরিচিতি। ওখান থেকে আসতে ঘণ্টাখানেকও লাগবে না। জিনিসপত্র সেখানেই রেখে এসেছি। কাল তা হলে আসব?"

"বেশ। আপনারি গাড়িতে যে কাগজপত্র আছে দিয়ে যান।"

"নিশ্চয়ই। আপনাকে দক্ষিণা বাবদ কত দিতে হবে এখন?"

"দক্ষিণা পরে। আপাতত খরচ বাবদ হাজার তিনেক দেবেন। যদি কেস হাতে না নিই তা হলে আগামীকাল টাকা ফেরত পাবেন।"

হরিপদ সেন তৈরি হয়েই এসেছিলেন। পকেট থেকে একটা মোটা বাণ্ডিল বের করে গুনে-গুনে তিন হাজার টেবিলে রাখলেন। রেখে বললেন, "কেসটা রিফিউজ করবেন না মিস্টার সোম। প্লিজ।"

অমলদা কোনোও কথা না বলে অর্জুনকে ইঙ্গিত করলেন হরিপদ সেনের সঙ্গে যেতে। বাগান পেরিয়ে গাড়ির পেছনের সিটের নীচে ফেলে রাখা একটা কাপড়ের ব্যাগ থেকে মোটা চওড়া খাম বের করে

ভদ্রলোক অর্জুনের হাতে দিলেন।

অর্জুন বললেন, "এগুলো এভাবে ফেলে রেখেছেন ?"

ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে হরিপদ জবাব দিলেন, "বাজারের ব্যাগে রেখেছি বলে কেউ সন্দেহ করবে না। আচ্ছা, আসি।"

গাড়িটা বেরিয়ে গেলে অর্জুন ভেতরে এসে অমল সোমের হাতে প্যাকেটটা দিলো। তিনি সেটা নিয়ে বললেন, "বেশির ভাগ অপরাধের পেছনে কাজ করে মানুষের লোভ। ও হ্যাঁ, বিষ্টুসাহেব এখানে আসছেন। তখন খবরটা বলা হয়নি। কাল চিঠি পেয়েছি।"

"বিষ্টুসাহেব ?" চিৎকার করে উঠলো অর্জুন। আনন্দে। কালিম্পং-এর বিষ্টুসাহেব। এখন আমেরিকায় আছেন। চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। সে কিছু বলার আগেই অমলদা ভাঁজ করা কাগজটা এগিয়ে দিলেন, "এটা পড়ো আগে।"

কাগজটা খুললো অর্জুন। সুন্দর হাতের লেখা :

"হরিপদ সেন। যা করছো তাই করে খাও। নন্দলালের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ালে হাত খসে যাবে ঃ কালাপাহাড়।"

২

নেতাজির স্ট্যাচুটাকে বাঁ দিকে রেখে করলা সেতুর ওপর উঠে বাইকটাকে থামালো অর্জুন। একপাশে সেটাকে দাঁড় করিয়েরেখে রেলিংয়ে ভর করে নদীর দিকে তাকালো। এখন নদীর জল কচুরিপানায় ছাওয়া। আর একটু দূরে যেখানে করলা গিয়ে তিস্তায় পড়েছে, সেখানে জল স্থির হয়ে গেছে চড়া ওঠায়। এই জায়গাটা বড় ছিমছাম, নির্জন। অর্জুন একটা সিগারেট ধরালো।। গত বছর ভোট দিয়েছে সে। এখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক। কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরের মানুষেরা এখনও কিছু ব্যাপার মেনে চলে। অর্ধপরিচিত বয়স্ক মানুষ দেখে অনেকেই সিগারেট লুকোয়। পরিচিতি বেড়ে যাওয়ায় অর্জুনের পক্ষে অচেনা মানুষকে বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে এইরকম নির্জন জায়গা বেছে নিতে হয় সেই কারণে।

পুরো ব্যাপারটাকেই তার অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব মনে হচ্ছে। অথচ অমল সোম বললেন, "ইন্টারেস্টিং।"

কয়েকশো বছর আগে একটি অত্যাচারী সেনাপতি কোথায় কী লুকিয়ে রেখেছিল তাই খোঁজার দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে এসেছেন হরিপদ সেন। এ যেন হিমালয়ের বরফের মধ্যে থেকে একটা সূঁচ খুঁজে নিয়ে আসার মতো ব্যাপার। লোকটাকে স্বচ্ছন্দে পাগল বলা যেতো, যদি না ওই চিঠিটা তিনি দেখাতেন। হঠাৎ অর্জুনের মনে হলো, এই চিঠি হরিপদবাবু নিজেই লিখে নিয়ে আসতে পারেন ঘটনার গুরুত্ব বাড়াতে। অমলদা এটা ভাবলেন না কেন? এমন চিঠি অন্য কাউকে দিয়ে লেখানোর বোকামি কেউ করে না, নিশ্চয়ই হরিপদ সেনও নির্বোধ নন। ভদ্রলোকের হাতের লেখার নমুনা যদি পাওয়া যেতো! কিন্তু মুশকিল হলো কোনোও সমস্যারই এতো সহজে সমাধান হয় না।

জীবিত মানুষকে খুঁজে পেতেই হিমশিম খেতে হয়, আর এ তো মৃত মানুষ। পনেরশো আশি খ্রিস্টাব্দে যে মানুষটি মারা গিয়েছে সে কোথায় কিছু সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে পাওয়া। অর্জুন হেসে ফেললো। এই তো, কুড়ি বছরেই জলপাইগুড়ির চেহারা কতো বদলে গেল। আটষট্টির বন্যার আগে শহরটার চেহারা নাকি অন্যরকম ছিল। অমলদা বলেন, তিস্তায় বাঁধ হওয়ার আগে চরে অদ্ভুত চেহারার ট্যাক্সি চলতো। এসব এখন কি তারা ভাবতে পারে? অতো কথা কি, জলপাইগুড়ির খেলাধুলোর জগতে যাঁর দান সবচেয়ে বেশি সেই রায়সাহেব তো মারা গিয়েছেন কয়েক বছর হলো। এখন যদি তাঁকে বলা হয় রায়সাহেব, কখন কোথায় গিয়েছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আবিষ্কার করো, তা হলে কি সে সক্ষম হবে? অথচ অমলদা বলে দিলেন কাল সকালের মধ্যে কালাপাহাড় লোকটা, মানে ইতিহাসের সেই সেনাপতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে এসো। কালাপাহাড় সম্পর্কে চালু ইতিহাস বইয়ে নাকি দু-চার লাইনের

বেশি জানতে পারা যায় না। এখন লাইব্রেরি খোলার সময় নয়। তা হলে বাবুপাড়া পাঠাগারে গিয়ে দেখা যেতো কালাপাহাড়ের ওপর কোনোও বই পাওয়া যায় কি না! সিগাগারেট শেষ হলো তবু অর্জুন ভেবে পাচ্ছিলো না অমল সোম এরকম কেস নিলেন কেন! আগামী-কাল সকালে যদিও দেখা করতে বলেছেন, আর সেটাই তো নেওয়ার লক্ষণ।

এই সময় ওর গৌরহরিবাবুর কথা মনে পড়লো। স্কুলে ইতিহাস পড়াতেন। খুব পণ্ডিত মানুষ। দু'বছর আগে অবসর নিয়ে সেন-পাড়ায় আছেন। অনেককাল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। অবসর নেওয়ার কথাটা সে শুনেছিল। খুব রাগী মানুষ, পড়া না করে এলে ক্ষেপে যেতেন। অর্জুন বাইক ঘোরালো।

সেনপাড়ায় গৌরহরিবাবুর বাড়িতে সে ছাত্রাবস্থায় একবার এসে-ছিল। আজ খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। টিনের ছাদ, গাছপালা আছে। রাস্তার দিকটা টিনের দেওয়াল তুলে একটু আব্রু রাখার চেষ্টা। গরিব মাস্টারমশাইয়ের কোনোও ছেলেমেয়ে নেই। অর্জুন বাইরের দরজায় তিনবার শব্দ করার পর একটি মহিলা কণ্ঠ ভেসে এলো, "কে?"

"সার আছেন? আমি অর্জুন।"

তিরিশ সেকেণ্ড বাদে দরজাটা খুললেন এক প্রৌঢ়া, ওঁর শরীর ভালো নেই।"

"ও, ঠিক আছে তা হলে।" অর্জুন ফেরার জন্য ঘুরছিল, এই সময় ভেতর থেকে গৌরহরিবাবুর গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ গো, কে এসেছে, সার বললো যেন?"

"তোমার নাম অর্জুন বললে?" প্রৌঢ়া জিজ্ঞেস করতেই সে মাথা নাড়লো। তিনি তখন গলা তুলে সেটা জানিয়ে দিতেই গৌরহরি-বাবু ভেতরে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

অর্জুন উঠোনে পা দিলো। নানারকম ছোট গাছে উঠোন সাজানো।

টাঙানো দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছে। গলার স্বর যেদিক থেকে এসে-ছিল সেদিকের বারান্দায় পা দিলো সে। দরজা দিয়ে ভেতরের ঘর-টিতে যে আলো ঢুকছে তাতেই গৌরহরিবাবুকে দেখা গেল। একটা খাটে শুয়ে আছেন তিনি, মুখে হাত চাপা দিয়ে। অর্জুন বললো, "সার, আপনি অসুস্থ?"

হাত সরালেন গৌরহরিবাবু, "অর্জুন মানে, আমার ছাত্র যে গোয়েন্দা হয়েছে?"

অর্জুন হাসলো, "আমি বলি সত্যসন্ধানী।"

"ভালো শব্দ। গর্ব হয়। বুঝলে হে। তোমরা যারা নাম করেছ তাদের জন্য গর্ব হয়। অসুস্থ, মানে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস। চোখে কম দেখি। এখন আলো পড়লে কষ্ট হয়। তা কী ব্যাপার বাবা? আমার কথা হঠাৎ মনে পড়লো কেন?" চোখ বন্ধ করেই প্রশ্ন করলেন গৌর-হরিবাবু। অর্জুন অস্বস্তিতে পড়লো। ঠিক কীভাবে প্রশ্নটা করবে বুঝতে পারছিল না। তা ছাড়া শুধু স্বার্থের প্রয়োজনে সে এসেছে এটা জানাতেও খারাপ লাগছিল।

অর্জুন বললো, "আপনি অসুস্থ, আপনাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।"

"কথা বলতে তো কোনোও অসুবিধে নেই। চোখ বন্ধ রাখতে হবে এই যা।"

"আমি একটু সমস্যায় পড়েছি। ইতিহাসে কালাপাহাড় নামে একটি মানুষের কথা পড়েছিলাম। আপনার কাছে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।"

"কালাপাহাড়? দাউদ খাঁয়ের সেনাপতি। পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে মারা যান।"

"হ্যাঁ। ওঁর সম্পর্কে বিস্তারিত খবর কোথায় পাবো?"

"বিস্তারিত জানতে হলে অনেক বই পড়তে হবে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে 'হিস্টরি অব বেঙ্গল' নামে একটা বই বেরিয়েছিল,

এখানে তো পাবে না। এই উত্তর বাংলায় কালাপাহাড়ের আনাগোনা ছিল। মনে করে তোমাকে আমি একটা বই-এর লিস্ট তৈরি করে দেবো যা পড়লে অনেকটাই জেনে যাবে। এই কালাপাহাড়ের আসল নাম কী জানো?"

"উনি আগে হিন্দু ছিলেন।"

"হ্যাঁ। তখন হয় রাজকৃষ্ণ, রাজচন্দ্র নয় রাজনারায়ণ, এই তিনটির একটি হলো ওঁর আসল নাম। লোকে জানতো রাজু বলে। মুসলমান ঐতিহাসিকরা দাবি করেছিলেন যে, উনি আফগান। এই দাবির পক্ষে কোনোও প্রমাণ নেই। অসমে গেলে দেখবে লোকে ওঁকে পোড়াকুঠার, পোড়াকুঠার অথবা কালাকুঠার বলে চেনে। আমাদের কী অবস্থা. চারশো বছর আগের ঘটনাতে কতো ধোঁয়াশা ছড়িয়ে আছে।"

অর্জুন আজকাল পকেটে একটা ছোট্ট ডায়েরি রাখে। তাতেই গৌরহরিবাবুর বলা নামগুলো নোট করে নিচ্ছিলো। গৌরহরিবাবু একটু ভেবে নিলেন, "রাজু ব্রাহ্মণের ছেলে। কিন্তু শাস্ত্র ছেড়ে অস্ত্র চালাতে সে পারদর্শী হয়ে উঠলো। ছেলের এই মতিগতি তার বাবার পছন্দ হওয়ার কথা নয়। তখন বাংলার নবাব সুলেমান কিরানি। কিন্তু ছোটো-ছোটো নবাবের সংখ্যাও বেশ। এরা নামেই নবাব, আসলে জায়গিরদার ধরনের। সুলেমান কিরানিকে কর দিতো। এই রকম এক জায়গিরদারের মেয়ের প্রেমে পড়লো রাজু। মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণতনয়ের সম্পর্ক হলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া চারশো বছর আগে হতে পারতো তা অনুমান করতে পারো নিশ্চয়ই।"

হঠাৎ থেমে গেলেন গৌরহরিবাবু। কিছু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "বাঙালির ইতিহাসটা তুমি জানো তো?"

অর্জুন ফাঁপরে পড়লো। সে যেটুকু জানে তা গত দুশো বছরের। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ এ-দেশের দখল নেওয়ার পরে যা ঘটেছিল সেই ঘটনাগুলো। স্বীকার করলো সে। গৌরহরিবাবু হাসলেন, "না, এতে সঙ্কোচ করার কিছু নেই। তোমরা জানো না সেটা আমা-

দের লজ্জা। আমরা ইতিহাস বইয়ে রাজা নবাবের গল্প লিখি। তাই পাঠ্য হয়। কিন্তু নিজেদের কথা আলাদা করে তোমাদের পড়াইনি। আমরা আবেগে চলি। ইতিহাস খুবই বাস্তব।"

অর্জুন চুপচাপ রইলো। কালাপাহাড়ের কথা জানতে এসে কেন বাঙালির ইতিহাস শুনতে হবে এই প্রশ্ন করা যায় না। তবে বাঙালি হিসেবে নিজেদের ইতিহাসটা নিশ্চয়ই জানা দরকার।

গৌরহরিবাবু বললেন, "আগে যাদের আদি অস্ট্রেলীয় বলা হতো এখন তাদের ভেড্ডিড বলা হয়। এরাই ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। লম্বা মাথা, চওড়া নাক, কালো রং আর মধ্যম আকার। এখনও বাঙালিদের মধ্যে ভেড্ডিডদের কিছু শব্দ চালু আছে, গ্রামের হাটে গেলে শুনবে এক কুড়ি পান, দু' কুড়ি লেবু। হাত-পায়ের আঙুল মিলিয়ে এই কুড়ি শব্দটি ভেড্ডিডদের দান। অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী মানুষেরা এককালে এ-দেশের নদনদী পাহাড় আর জায়গার যে নামকরণ নিজেরা করেছিল এখনও আমরা তাই বলি। যেমন কোল দব-দাক বা দাম-দাক থেকে কপোতাক্ষ বা দামোদর নদ। দা বা দাক মানে জল।

"বাংলা নামটা এলো কোত্থেকে? আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরি বইয়ে বলেছেন বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে বঙ্গাল বা বাংলা হয়েছে। আল মানে একটা বাঁধ। জলের দেশে বাঁধ দরকার হয়। তাই বাংলা। বাংলাদেশে একসময় অনেক মানুষের ভিড়। বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ়। বঙ্গের নাম মহাভারতে আর বৃহৎসংহিতায় পাওয়া যায়। আমি এসব বেশি বললে তুমি হয়তো বিরক্ত হবে। ওই চারটি ভাষার মানুষ চারটি জায়গা জুড়ে ছিল যা পরে সমগ্র বাঙালি জাতির মাতৃভূমি বলে চিহ্নিত হয়েছে। আগে ছিল সব টুকরো-টুকরো। এ ওর ভাষা বুঝতো না। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক এসে মুর্শিদাবাদ থেকে ওড়িশা পর্যন্ত একটা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেহারা দেন। শশাঙ্কের পর

তিনটে জনপদ হলো। পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় এবং বঙ্গ। পাল আর সেন-রাজারা সমস্ত বাংলাদেশকে গৌড় নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভব হয়নি। তিনটে কমে দুটোতে এসে ঠেকেছিল। গৌড় এবং বঙ্গ।

"শশাঙ্কের পর এ-দেশে মাৎস্যন্যায় চলেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে নানা ভাষার মানুষ এখানে এলো। এমন কী কাশ্মিরের রাজা মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য পর্যন্ত গৌড় আক্রমণ করে বিজয়ী হন। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। বাংলার অন্য রাজারা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী। শশাঙ্ক সম্ভবত হর্ষবর্ধনের জন্যই বৌদ্ধধর্মবিরোধী। এর পরে গোপালদেব এসে মাৎস্যন্যায় দূর করেন। শুরু হলো পাল বংশ। আজকের বাঙালি জাতির গোড়াপত্তন হয়েছে এই যুগেই। অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। সেই অর্থে বাঙালির ইতি-হাস হাজার বছরের বেশি নয়।"

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমাদের ইতিহাস মাত্র হাজার বছরের?"

"হ্যাঁ। তাও ধাপে-ধাপে এগিয়েছে। লক্ষ্মণসেনরা ছিলেন কর্নাটকের মানুষ। ওঁর পূর্বপুরুষ পালরাজার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে-ছিলেন। কয়েকপুরুষ থাকার ফলে এখানকার মানুষ হয়ে যান শেষ পর্যন্ত। তা আজকের বাঙালির অনেকের পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। তারপর মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি লক্ষ্মণসেনকে ঢাকার কাছে লক্ষ্মণাবতীতে পাঠিয়ে এদেশ দখল করে নিলেন। পালেদের সময় এদেশে বৌদ্ধরা এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রভাব খুব সীমায়িত ছিল। পাঠানরা ক্ষমতা পাওয়ার পর এদেশে যারা কিছুটা নির্যাতিত তারা পরিত্রাণপাওয়ারজন্যমুসলমানহলেন। কেউ-কেউ চাপে পড়ে বা অতিরিক্ত সুবিধে পাওয়ার জন্যও ধর্মবদল করেন। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এইসব ধর্মান্তরিত মানুষকে হিন্দু বাঙালি সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু নবাবের ভয়ে সরাসরি কোনোও

ব্যবস্থাও নিতে পারেনি। সামাজিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের দুটি ধারা পৃথকভাবে বয়ে চলে। দিনে-দিনে এ-দেশীয় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। এইরকম পরিস্থিতিতে রাজু বা রাজকৃষ্ণ ধর্মান্তরিত হন।

"সে-সময় হিন্দু থেকে মুসলমান অথবা বৌদ্ধ হওয়া খুব সহজ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণতা অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য হিন্দু-ধর্মে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। পাঠানদের এদেশের মানুষ সাধারণত শত্রু বলেই মনে করতো। তাদের ধর্ম যেসব স্বদেশী গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষমা করার উদারতা এদের ছিল না।

"ধর্মান্তরিত রাজু তাই বিতাড়িত হলো। তার পরিবার বন্ধুবান্ধব-দের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সে বাধ্য হলো। পরবর্তীকালে রাজুকে আবার ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করেনি। মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নির্মমভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই আচরণ তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। স্বভাবতই হিন্দুবিদ্বেষী হতে তার বেশি দেরি হয়নি। রাজু ক্রমশ নবাবের সৈন্যদলে বিশিষ্ট হয়ে উঠলো। নবাবি সৈন্য যখন কোনোও অভিযান করতো তখন তার লক্ষ্য ছিল সেই অঞ্চলের মন্দির ভাঙা, বিগ্রহ চূর্ণ করা আর হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালানো। আর এই কারণেই লোকে তার নামকরণ করলো কালা-পাহাড়।"

কালাপাহাড়ের প্রসঙ্গে চলে আসায় অর্জুন খুশি হলো। এতক্ষণ সে একটু বিষণ্ন ছিল। ইংরেজ বা ফরাসিরা নাকি হাজার-হাজার বছর ধরে নিজেদের সভ্য করেছে, রোমানদের সংস্কৃতিও সেইরকম। কিন্তু বাঙালির নিজস্ব কোনোও সংস্কৃতি হাজার বছরের বেশি নয়, এটা ভাবতে তার খুব খারাপ লাগছিল।

গৌরহরিবাবু একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন, "কালাপাহাড় সুলোমান কিরানি এবং পরে ওঁর ছেলে দাউদের সেনাপতি হয়ে-ছিলেন। ওদিকে অসম আর এদিকে কাশী এবং ওড়িশার প্রায়

কোনোও মন্দির কালাপাহাড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। বোঝা যাচ্ছে এই অঞ্চল জুড়ে ওর গতিবিধি ছিল। গল্পে আছে, মন্দির ধ্বংস করার আগে কালাপাহাড় সৈন্যদের দূর থেকেই কাড়ানাকাড়া বাজাতে বলতো।

"কালাপাহাড় ওড়িশা-অভিযান করে পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে। তখন রাজা মুকুন্দদেব পুরীতে। মুকুন্দদেবের পরাজয় হয়। ওঁর ছেলে গৌড়িয়া গোবিন্দকে পদানত করে কালাপাহাড় পুরীর মন্দির ধ্বংস করতে যায়। পাণ্ডারা এই খবর পেয়ে জগন্নাথদেবের মূর্তি নিয়ে গড় পারিকুদে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। কালাপাহাড়ের হাত থেকে তবু সেই মূর্তি রক্ষা পায়নি। জগন্নাথদেবের মূর্তি পুড়িয়ে সে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। কালাপাহাড়ের অনেক আগে তিনশো আঠারো খ্রিস্টাব্দে রক্তবাহু নামে একজন পুরী আক্রমণ করেছিল কিন্তু তখন পাণ্ডারা জগন্নাথদেবকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

"আকবরনামায় আছে দাউদের বিদ্রোহী স্বভাবের জন্য মুঘল সম্রাট সেনাপতি মুনিম খাঁকে পাঠায় তাকে বন্দী করতে। কালাপাহাড় দাউদের সেনাপতি হিসেবে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। একসময় সে কাক্সাল নামে একটি জায়গাও অধিকার করে। কিন্তু পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে কালীগঙ্গার তীরে মোগলবাহিনীর তোপে কালাপাহাড় মারা যায়।

"একজন বাঙালি হিসেবে কালাপাহাড় আমাদের ইতিহাসের প্রথম দিকে সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্র। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে লোকটা কোথায় গিয়ে পেঁছেছিল। ব্রাহ্মণরা ওকে হিন্দুবিদ্বেষী করেছিল। সেই মানুষ আজ কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটি রহস্য আমাকে খুব ভাবায়। আমি অনেককে চিঠি লিখে-ছিলাম। কেউ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তুমি শুনতে চাও?"

"বলুন।" অর্জুন এখন এই কাহিনীরসে প্রায় ডুবে গিয়েছে।

"কালাপাহাড় ওড়িশা অভিযান করে পনেরোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে।

তার ঠিক বত্রিশ বছর, মাত্র বত্রিশ বছর আগে এক বাঙালি মহাপুরুষের পুরীতে মৃত্যু হয়। তিনি শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীতে গিয়েছিলেন পনেরশো দশ খ্রিস্টাব্দে। তখন পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর ভক্ত হন। পরে যখন চৈতন্য পুরীতে পাকাপাকি বাস করছেন তখন রাজা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনোও কাজ করতেন না। পনেরশো কুড়ির পর থেকে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই সময় কাটাতেন। জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস আর তিনি মহাপুরুষের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন। রাজার এক ভাই গোবিন্দ বিদ্যাধর পাণ্ডাদের ক্ষেপিয়ে তুললেন। তাদের বোঝানো হলো রাজা জগন্নাথের চেয়ে চৈতন্যকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। যে চৈতন্য জাত বিচার করলো না, রাজা যদি তাঁর শিষ্য হন তা হলে জগন্নাথের মন্দির তো অপবিত্র হয়ে যাবে। পুরীতে তখন কিছু বৌদ্ধসঙ্ঘ ছিল। রাজার ভাই তাঁদেরও ক্ষেপিয়ে তুললেন চৈতন্যের বিরুদ্ধে। রাজা না-জগন্নাথ না-বৌদ্ধসঙ্ঘ কারও দিকে নজর দিচ্ছেন না, শুধু চৈতন্য নামে নবদ্বীপ থেকে আসা লোকটির মায়ায় ভুলে আছেন, এই তথ্য অনেককেই ক্রুদ্ধ করলো। গোবিন্দ বিদ্যাধর গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো।

"চৈতন্যদেব জগন্নাথে লীন হননি, সমুদ্রে ভেসে যাননি। তা হলে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যেত। শুধু তিনি নন, তাঁর পার্ষদদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। পনেরশো তেত্রিশের ঊনত্রিশে জুন দুপুর থেকে রাত্রের শেষ ভাগ পর্যন্ত জগন্নাথদেবের মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল। চৈতন্যদেবকে সপার্ষদ সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর তাঁরা উধাও। রাজা এই অন্তর্ধানের তদন্ত করতে চেয়েও সফল না হয়ে কটকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যুবরাজকে পাঠিয়েছিলেন। যুবরাজ মাস-চারেকের মধ্যেই নিহত হন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক এবং পাণ্ডাদের শত্রু হিসেবে প্রচার করে যাঁর লাভ হতো সেই রাজার ভাই গোবিন্দ বিদ্যাধরের সিংহাসন

দখল করার বাসনা পূর্ণ হয়নি।
"নবদ্বীপে নিশ্চয়ই এই খবর পেঁছেছিল। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ হয়ে লীন হয়ে গেছেন, এই বিশ্বাস অনেকেই করেননি। পুরী অভিযানের আগে কালাপাহাড় গিয়েছিল নবদ্বীপে। অদ্ভুত ব্যাপার, সে সেখানকার মন্দিরের ওপর তেমনভাবে ক্রুদ্ধ হতে পারেনি। সেই প্রথম সে জানতে পারে চৈতন্য নামের একটি মানুষ হিন্দু-মুসলমানকে সমানভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। মুসলমানকে আলিঙ্গন করেছেন। কোনোও ভেদাভেদ রাখেননি। এই তথ্য কি কালাপাহাড়ের হৃদয়ের ক্ষতকে শান্ত করেছিল? তার নিজের অভিজ্ঞতার বিপরীত ছবি দেখে সে কি চৈতন্য সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল? তার কানে কি চৈতন্যের অন্তর্ধানের খবর পেঁছেছিল? পাণ্ডাদের রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন চৈতন্য, এইরকম ধারণা করেই কি সে প্রতিশোধ নিতে পুরী অভিযান করেছিল? মাত্র বত্রিশ বছর পরেই আর-এক বাঙালির এই অভিযান কি শুধুই রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা? কালাপাহাড় অন্য জায়গার মন্দির ধ্বংস করেছে। কিন্তু জগন্নাথের মন্দির পাণ্ডাদের দখলে বলে কোন্ প্রতিশোধের ইচ্ছায় বিগ্রহ পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল? কেউ উত্তর দিতে পারেননি। যদি আমার সন্দেহ সত্যি হয় তাহলে কালাপাহাড়ের চরিত্রের আর-একটি দিকে আলো পড়বে। আমরা নতুনভাবে বিস্মিত হবো।"

এই সময় সেই প্রৌঢ়া দরজায় এসে দাঁড়ালেন, "তুমি অনেকক্ষণ কথা বলেছ। আর নয়।"

গৌরহরিবাবু হাসলেন, "প্রিয় বিষয়, পুরনো ছাত্র!"

"তা হোক। দরকার থাকলে না হয় পরে আসবে।"

অর্জুন উঠে দাঁড়ালো, "সার, আমি চলি। দরকার হলে পরে আবার আসবো।"

গৌরহরিবাবু শুয়ে-শুয়েই হাত নাড়লেন। তাঁর চোখ বন্ধ। প্রায় দৃষ্টিহীন এই ইতিহাস-প্রেমিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অতীত দেখে যান

চুপচাপ, অর্জুনের তাই মনে হলো।
লাল মোটরবাইকে চেপে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় অর্জুন হেসে ফেললো। হরিপদ সেন চেয়েছিলেন কালাপাহাড় উত্তর বাংলার কোন্ কোন্ অঞ্চলে ছিলেন এবং সেখানে ওই বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এমন জায়গা আছে কি না যেখানে সোনাদানা পুঁতে রাখা সম্ভব, তা খুঁজে বের করে দিতে। সারের সঙ্গে কথা বলে তার ধারে কাছে যাওয়া গেল না। শুধু কালাপাহাড় সম্পর্কে একটা ভাসা-ভাসা ছবি পাওয়া গেল, আর সেইসঙ্গে বাঙালির ইতিহাস। অবশ্য অমল সোম শুধু এটুকুই চেয়েছিলেন।
কদমতলার বাসস্ট্যাণ্ডে পেঁছে সে অবাক। হাবু রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অমলদার এই স্বাস্থ্যবান বোবা-কালা কাজের লোকটিকে খুব ভালবাসে অর্জুন। তাকে দেখামাত্র হাবু হাত-পা নেড়ে মুখ বেঁকিয়ে বুঝিয়ে দিলো অমলদা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বোঝামাত্র হাবুকে পেছনে বসিয়ে মোটরবাইক ঘুরিয়ে হাকিমপাড়ার দিকে ছুটে গেল অর্জুন।

৩
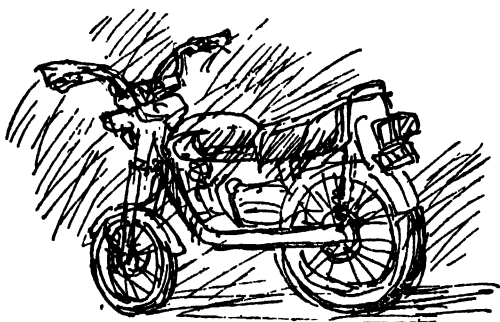
হাবু সম্পর্কে অর্জুনের একটা কৌতূহল আছে। অনেকদিন ধরে দেখে আসছে সে এই লোকটাকে। অমলদা কোত্থেকে ওকে পেয়েছিলেন, কেমন করে হাবু এতসব শিখে গেল, তা কখনওই গল্প করেননি। আজকাল অমলদা অনাবশ্যক কথা বলেন না। হাবুর গায়ে ভীষণ জোর, বুদ্ধি মাঝে-মাঝে খুলে যায়, কিন্তু বোবা-কালা মানুষটি অমলদার পাহারাদার ওরফে রাঁধুনি ওরফে মালি ওরফে সবকিছু হয়ে দিব্যি রয়ে গেছে। মোটরবাইকের পেছনে বসে হাবু শক্ত হাতে তাকে ধরে আছে এখন। ওকে আঙুল আলগা করতে বলে কোনোও লাভ নেই, হাবু শুনতেই পাবে না।
সনাতন নামের সেই লোকটা যখন অমলদার বাড়িতে এসেছিল তখন মোটেই খুশি হয়নি হাবু। তখন সনাতন যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। লোকটা সত্যি অদূর ভবিষ্যৎ দেখতে পেত। হঠাৎ কোথায়

উধাও হয়ে গেল কে জানে। অমলদা সনাতনকে কোত্থেকে জোগাড় করেছিলেন তাও রহস্য। হাকিমপাড়ায় ঢুকে মোটরবাইক যখন বাঁক নিচ্ছে তখন পিঠে মৃদু টোকা মারলো হাবু। অর্জুন বাইকটাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করাতেই টপ করে নেমে পড়লো হাবু। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো?"
যে মানুষ ওর সঙ্গে কথা বলছে তার ঠোঁটনাড়া দেখতে পেলে হাবু যেন বুঝতে পারে। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে হাত নেড়ে ওপাশের দোকানগুলো দেখিয়ে হাঁটা শুরু করলো। অর্থাৎ কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরবে। অনেকদিন আগে অর্জুন একবার অমলদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "বোবা-কালা একজন মানুষের সঙ্গে থাকতে অসুবিধে হয় না?" অমলদা মাথা নেড়েছিলেন, "আমার খুব সুবিধেই হয়। বাড়িটা নিস্তব্ধ থাকে। নিজের মনে কাজ করতে পারি। অনবরত কারও বকবকানি শুনতে হয় না।"
গেটের সামনে পেঁছে ব্রেক কষলো অর্জুন। অনেকখানি ঘষটে গিয়ে দাঁড়ালো বাইকটা। মাঝে-মাঝে তার ইচ্ছে হয় সার্কাসের বাইকওয়ালার মতো কোনোও ছোট নালা বাইক নিয়ে টপকে যেতে। এখনও ঠিক সাহসটা আসছে না।
গেট খুলে পা বাড়াতেই অমলদার হাসির শব্দ শোনা গেল। বেশ প্রাণখোলা হাসি। অনেককাল অমলদাকে এভাবে হাসতে শোনা যায়নি। আর-একটু এগোতে একটা গলা কানে এলো, "তার মানে নিরোর সময় বাঙালি বলে কোনোও জাত ছিল না? ইস, এখন নিজেকে একেবারে যাকে বলে ভুঁইফোড়, তাই মনে হচ্ছে।"
এই গলা ভোলার নয়। বসার ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় উঠে দরজায় দাঁড়াতেই বিষ্টুসাহেবকে দেখতে পেলো অর্জুন। পা ছড়িয়ে বসে আছেন। রোগা বেঁটেখাটো মানুষটাকে এখন আরও বুড়ো দেখাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই তিনি চিৎকার করলেন, "আরে, তৃতীয় পাণ্ডব, এ যে একেবারে নবীন যুবক, ভাবা

যায় ?”
অর্জুন ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে প্রণাম করলো, “কেমন আছেন ?”
বিষ্টুসাহেব দু' হাতে বাতাস কাটলেন, “নতুন শক্তি পেয়েছি হে ।”
“আমেরিকানরা আমার শরীরের যেসব জায়গা রোগের কামড়ে বিকল করেছিল তা ছেঁটেকেটে বাদ দেওয়ার পর আর কোনোও প্রবলেম নেই ।” নিজের বুকে হাত দিলেন তিনি, “বাইপাস সার্জারি ।”
অর্জুনের খুব ভালো লাগছিল । সে বিষ্টুসাহেবের পাশে গিয়ে বসলো । তার চোখের সামনে এখন কালিম্পং-এর দিনগুলো, লাইটার খুঁজতে আমেরিকায় যাওয়া আর বিষ্টুসাহেবের হাসিখুশি মুখ ক্রমশ রোগে পাণ্ডুর হয়ে যাওয়া ছবিগুলো ভেসে গেল । বিষ্টু-সাহেব যে আবার এমন তরতাজা কথা বলবেন তা কল্পনা করতে পারেনি সে । অমলদা বললেন, “অর্জুনকে তো দেখা হয়ে গেল, এবার খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম করুন । অনেকদূর পাড়ি দিতে হয়েছে আমাকে ।”
মাথা নাড়লেন ছোট্টখাট্টো মানুষটি । একমুখ হাসি নিয়ে চুপ করে রইলেন খানিক । তারপর বললেন, “নো পরিশ্রম । জে এফ কে থেকে হিথরো পর্যন্ত ঘুমিয়ে এসেছি । হিথরোতে কয়েক ঘণ্টা চমৎকার কেটেছে । হিথরো থেকে দিল্লি নাক ডাকিয়েছি । দিল্লিতে এক রাত হোটেলে । উত্তেজনায় ভালো ঘুম হয়নি অবশ্য । আর দিল্লি থেকে বাগডোগরা আসতে ঘুমের প্রশ্নই ওঠে না । দেশের মাটিতে ফেরার উত্তেজনার সঙ্গে কোনোও কিছুর তুলনা করাই চলে না । এখন আমি একটুও ক্লান্ত নই ।”
“আপনি একাই এতটা পথ এলেন ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করলো ।
“ইচ্ছে ছিল তাই, কিন্তু আর-একজনকে বয়ে আনতে হলো ।” বিষ্টু-সাহেব চোখ বন্ধ করলেন, “মেজর এসেছেন সঙ্গে । তিনি গিয়েছেন কালিম্পঙে ।”
“অ্যাঁ, মেজর এসেছে !” প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো অর্জুন ।

হঠাৎ অর্জুনের গায়ে হাত বোলালেন বিষ্টুসাহেব, "নাঃ, এই ছেলেটা দেখছি একদম বড় হয়নি। সেই ফ্রেশনেশটা এখনও ধরে রেখেছে। বড় হলেই মানুষ কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। এবার ক'দিন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে, কেমন ?"

জমিয়ে আড্ডা বলে কথা! অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না সে কী করবে। অমলদা, বিষ্টুসাহেব, মেজর ও সে। কতদিন পরে এক জায়গায় হওয়া যাবে! সে জানতো মেজর আসছেন দিন-দুয়েকের মধ্যেই। এখানে ওঁরা কয়েকদিন থাকবেন।

বেলা বাড়ছিল। বিষ্টুসাহেবের ইচ্ছে ছিল অর্জুন এখানেই খেয়ে নিক। কিন্তু অমলদাই আপত্তিকরলেন। বাড়িতে বলা নেই,অর্জুনের মা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে বসে থাকবেন। তাই বাড়ি গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে অর্জুন বিকেলে চলে আসুক।

বিষ্টুসাহেব ভেতরে চলে গেলে অমলদা বললেন, "যাও, আর দেরি কোরো না। ও হ্যাঁ, কিছুটা আশা করি এগিয়েছ এর মধ্যে!"

"হ্যাঁ। ইতিহাস জানলাম। তবে আলগা-আলগা।"

"পাঁচশো বছরের আগে যাওয়ার দরকার নেই। শ্রীচৈতন্যদেব থেকে শুরু করো। ওই সময় কেউ তো ইতিহাস লিখব বলে লেখেনি।"

"আপনি মোটামুটি বাঙালির ইতিহাসটা জানেন ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করলো।

"যেটুকু না জানাটা অপরাধ সেটুকুই জানি।" অমলদা হাসলেন, "অর্জুন, তুমি তোমার ক'জন পূর্বপুরুষের নাম জানো ?"

অর্জুন মনে করার চেষ্টা করলো। বাবা-ঠাকুর্দার নাম ধর্তব্যের মধ্যে আসছে না। বাবার ঠাকুর্দার নাম সে জানে। মা বলছিলেন বাড়িতে একটা কাগজে চৌদ্দপুরুষের নাম নাকি লিখে রেখেছিলেন বাবা। তিনি মারা যাওয়ার পর সে আর ওই কাগজপত্র দেখেনি। তাই পূর্ব-পুরুষ বলতে তার আগের তিন পুরুষেই এখন তাকে থেমে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ এটা মনে হতে লজ্জা করলো অর্জুনের। আমরা বাহাদুর

শা'র পূর্বপুরুষের নাম জানি অথচ নিজের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে উদাসীন। বাবার লেখা কাগজটা যদি না পাওয়া যায়, মায়ের যদি সেসব মনে না থাকে তা হলে তাদের বংশের অতীত মানুষগুলো চিরকালের জন্য অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন।

অমলদা বললেন, "ঠিকই, জেনে রাখা ভালো, কিন্তু দরকার পড়ে না বলে তিন-চার পুরুষের বেশি খবর রাখি না। চার পুরুষ মানে একশো বছর। কালাপাহাড় ছিলেন তোমার কুড়ি পুরুষ আগে। ব্যাপারটা তাই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। বিকেলে এসো, এ-ব্যাপারে কথা বলা যাবে।"

মোটরবাইকে উঠে অর্জুনের হঠাৎ একটা কথা মাথায় এলো। এই যে আমরা পুরুষ-পুরুষ করি, কেন করি? কেন বাবা-ঠাকুর্দাকে ধরে প্রজন্ম মাপা হচ্ছে এবং তাকে পুরুষ আখ্যা দেওয়া হবে? মা-দিদিমাকে ধরে নারী শব্দটাকে পুরুষের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন? আজ যখন ছেলেমেয়ে সমান জায়গায় এসে গিয়েছে তখন মেয়েরা এই পুরুষ-মাপা প্রথাটার বিরুদ্ধে কথা বলতেও তো পারে!

দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বাইক নিয়ে বের হলো অর্জুন। জলপাইগুড়ির ইতিহাস জানেন এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া দরকার। তার ছেলেবেলায় চারুচন্দ্র সান্যাল নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি মারা গিয়েছেন, যাঁর নখদর্পণে এসব ছিল বলে সে অমলদার কাছে শুনেছে। রূপশ্রী সিনেমার সামনে এসে সে বাইক থামালো। জগুদা আর-এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ভদ্রলোকের মুখে দাড়ি, কাঁধে ব্যাগ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে। তাকে দেখে জগুদা হাত তুললেন। মালবাজার ঘুরে এখন জগুদার অফিস শিলিগুড়িতে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেন। এই অসময়ে এখানে কোনো প্রশ্ন করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না সে।

জগুদা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, "এই যে, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো

আপনাকে বলেছিলাম। এরই নাম অর্জুন, আমাদের শহরের গর্ব। বিলেত আমেরিকায় গিয়েছিল সত্যসন্ধান করতে। আর ইনি হলেন ত্রিদিব দত্ত। মন্দির নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। কলকাতার কলেজে পড়ান।"

মন্দির নিয়ে গবেষণা করার কথা শোনামাত্র অর্জুনের মনে পড়লো কালাপাহাড়ের কথা। কালাপাহাড় তো একটার-পর-একটা মন্দির ভেঙেছেন। ইনি নিশ্চয়ই সেসব খবর রাখেন। সে নমস্কার করলো।

ত্রিদিববাবু বললেন, "আমরা এখানকার দেবী চৌধুরানির তৈরি মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই ভাই তোমার কথা ইনি বলছিলেন।"

"আমার কথা কেন ?"

"এ-দেশে মন্দিরের সঙ্গে অপরাধের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই কিছুকাল আগেই ডাকাতরা ডাকাতি করার আগে কালীর মন্দিরে পুজো দিতে যেতো। সেই প্রসঙ্গে অপরাধ নিয়ে আলোচনা করতে করতে অপরাধ-সাহিত্য থেকে গোয়েন্দাদের কথা এসে গেল। আমি ভাবতে পারছি না জলপাইগুড়ির মতো শহরে কেউ শুধু এই কাজ করে কীভাবে বেঁচে থাকতে পারে ? এখানে কেস কোথায় ?"

"অপরাধী তো সব জায়গায় থাকে।" অর্জুন বলতে-বলতে দেখলো ভদ্রলোকের কাঁধের কাপড়ের ব্যাগের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট লাঠির ডগা দেখা যাচ্ছে। লাঠিটা বেশ চকচকে এবং গোল।

জগুদা বললেন, "চললে কোথায় অর্জুন ?"

"একটু ইতিহাস খুঁজতে। জগুদা, জলপাইগুড়ির ইতিহাস ভালো কে জানেন ?"

"মলয়কে বলতে পারো। ওরা এসব নিয়ে থাকে।" এই সময় একটা জিপ এসে দাঁড়ালো সামনে। জিপটাকে অর্জুন চেনে। ভাড়া খাটে। জগুদা বললেন, "হাতে সময় থাকলে আমাদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পারো।"

"কোথায় যাচ্ছেন ?"
"জল্পেশের মন্দির দেখতে। ত্রিদিববাবু এর আগেও ওখানে গিয়েছেন কিন্তু আর-একবার ওঁর যাওয়া দরকার।"

অর্জুন মনে করতে পারছিল না আজ সকালে মাস্টারমশাই কালা-পাহাড় সম্পর্কে বলতে গিয়ে জল্পেশের মন্দিরের কথা উল্লেখ করে-ছিলেন কি না। কিন্তু কালাপাহাড় যদি এই অঞ্চলে থেকে থাকেন তা হলে ওই মন্দির নিশ্চয়ই তাঁর চোখে পড়েছিল। জল্পেশের মন্দির তো আরও প্রাচীন।

নিরালার পাশে মোটরবাইক রেখে অর্জুন জিপে উঠে বসলো। এখন তিনটে বাজে। হয়তো ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। কিন্তু অর্জুনের মনে হচ্ছিল একবার যাওয়া দরকার। হাসপাতালের সামনে দিয়ে রায়কতপাড়া পেরিয়ে জিপ ছুটছিল। ত্রিদিববাবু এবং জগুদা ড্রাই-ভারের পাশে বসেছিলেন। পেছনে বসে পিছলে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে। অর্জুন চুপচাপ ভাবছিল। রাজবাড়ির গেটের সামনে দুটো ছেলে হাতাহাতি করছে। তাদের ঘিরে ছোট্ট ভিড়। তারপরেই জিপ শহরের বাইরে। তিস্তা ব্রিজ সামনে। হঠাৎ অর্জুনের মনে হলো সে অতীত নিয়ে বড্ড বেশি ভাবছে। অথচ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন বর্ত-মানের কালাপাহাড় নামক এক অজ্ঞাত মানুষের কাছ থেকে যে হুমকি দেওয়া চিঠি পেয়েছেন তার কোনোও হদিস নেওয়া হচ্ছে না। হরিপদ সেন তাঁর পিতামহের-প্রপিতামহের লেখা কিছু কাগজপত্রের প্যাকেট অমলদাকে দিয়ে গিয়েছেন। সেখানে কী লেখা আছে তা অমলদা এখনও বলেননি। আজকাল সব ব্যাপারেই অমলদার উৎসাহ এমন তলানিতে এসে ঠেকেছে যে, হয়তো এখনও খুলেই দেখেননি ওগুলো। আগামীকাল হরিপদবাবু শিলিগুড়ি থেকে আবার আস-বেন অমলদার বাড়িতে। সেই সময় অমলদা তাঁকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর তা হলে তো সব কাজ চুকে যাবে। অর্জুনের মনে হলো আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা

করা উচিত।এখনই এত হাতড়ে বেড়ানোর কোনোও মানে হয় না। জিপ ততক্ষণে তিস্তা ব্রিজ পেরিয়েদোমহানির দিকে ছুটছে। দু'পাশে মাঠের মধ্যে দিয়ে পিচের রাস্তাটা বেঁকে গেছে ঘোড়ার পায়ের নালের মতো। মানুষজনের বসতি খুব কম। বাইপাস ছেড়ে জিপ ঢুকলো বাঁ দিকে। শহর থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে জল্পেশের মন্দিরে সে আগেও এসেছে। এ-সবই তার চেনা। মন্দিরে কোনোও শিবের মূর্তি নেই, আছে অনাদিলিঙ্গ। কেউ বলেন কোচবিহারের মহারাজ প্রাণনারায়ণ একটি স্তম্ভের মাথায় গাভীদের দুধ ছড়িয়ে দিতে দেখে এখানে এই মন্দির স্থাপন করেন।

অর্জুন প্রসঙ্গটা তুলতেই ত্রিদিববাবু বললেন, "খুব গোলমেলে ব্যাপার। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত সন্দেহ করেছেন এটি এক বৌদ্ধমন্দির ছিল। মেলার সময় ভোট-তিব্বত থেকে ঘোড়া কুকুর-কম্বল নিয়ে বৌদ্ধরা এখানে আসতেন। জল্পেশ্বর নামে এক রাজার কথাও শোনা যায় যিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে কেউ দাবি রেখেছে। আসামের ঐতিহাসিকরা বলেন ভিতরগড়ের পৃথুরাজারই নাম জল্পেশ্বর, যিনি বখ্‌তিয়ার খিলজিকে পরাজিত করেছেন। ভদ্রলোক মারা যান ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে। তার মানে মন্দিরের আয়ু প্রায় আটশো বছর। মাটির ভেতর থেকে শিবলিঙ্গ উঠে এসেছে ওপরে। পঞ্চাশ বছর আগে মন্দিরে সংস্কারের সময় একটা পরীক্ষা চালানো হয়। বোঝা যায় লিঙ্গটি সাধারণ পাথর নয়, উল্কাপিণ্ড। আকাশ থেকে খসে মাটিতে ঢুকে পড়ে। এই আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখে এখানকার মানুষ এঁকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করতে শুরু করে।"

"এই উল্কাপিণ্ডটা কবে পড়েছিল?"

"সময়টা ঐতিহাসিকরা আবিষ্কার করতে পারেননি।"

জিপ থামলো একটা অস্থায়ী হাটের মধ্যে। বোঝা যায় সপ্তাহে এখানে হাট বসে, এখন চালাগুলো ফাঁকা। মন্দিরের সামনে হাতির মূর্তি। ত্রিদিববাবু বললেন, "হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে হাতি খুব একটা মেলে

না। সম্ভবত এক সময় এখানে হাতির উপদ্রব হতো। পাথরের হাতি তৈরি করে পাহারায় বসিয়ে তাদের ভয় দেখানোর পরিকল্পনা হয়েছিল।"

জল্পেশ্বর মন্দিরের ভেতর অর্জুন ঢুকেছে। অতএব সেদিকে তার কোনোও আগ্রহ ছিল না। ত্রিদিববাবু আর জগুদা চলে গেছেন তাঁদের কাজে। অর্জুন দেখলো মন্দিরের পাশেই লম্বা বারান্দার একতলা ব্যারাকবাড়ি। সেখানে সম্ভবত দূরের ভক্তরা এসে ওঠেন। মানুষজন খুব কম। মন্দিরের এপাশে একটি পুকুর। সে ভালো করে দেখলো। মন্দিরের গায়ে কোনোও আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় কি না। কিছুই চোখে পড়লো না।

পুকুরের ধারে এসে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল অর্জুন, কিন্তু সামলে নিলো। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসছেন। তাঁর পায়ে খড়ম, শরীরে সাদাধুতি লুঙ্গির মতো পরা, গলায় রুদ্রাক্ষ এবং মুখে পাকা দাড়ি। তিনি হাসলেন, "আহা, মন চেয়েছিল যখন, তখন খাও। আমাকে দেখে সঙ্কোচ কেন?"

অর্জুন আরও লজ্জা পেলো। সে প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিলো। সন্ন্যাসীর মুখে বেশ স্নিগ্ধ ভাব, "মন্দিরে না গিয়ে এখানে কেন?"

"এমনই। মন্দিরের চেহারা দেখছিলাম। আপনি এখানে অনেকদিন আছেন?"

"দিন গুনিনি। তবে আছি!"

"এই মন্দিরে কবে শেষবার সংস্কারের কাজ হয়?"

"হৈমন্তীপুরের কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত সংস্কার করেন, তাও অনেকদিন হয়ে গেল। সময়ের হিসেব বাবা আমার গুলিয়ে যায়।"

"আচ্ছা, আপনি কি জানেন কালাপাহাড় এই মন্দিরের ওপর আক্রমণ করেছিলেন?"

সন্ন্যাসী হাসলেন, "এ-কথা কে না জানে! মন্দিরের চুড়োটা তখন এ-রকম ছিল না। কালাপাহাড় তখনকার চুড়ো ভেঙে ফেলেছিলেন।

কিন্তু ভগবানের কোনোও ক্ষতি করেননি। শোনা যায় মন্দিরের ভেতরেও তিনি ঢোকেননি।"

"আপনি কালাপাহাড় সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"আরে,তুমি বাবার মন্দিরে এসে কালাপাহাড় সম্পর্কে জানতে চাইছো কেন? মজার ছেলে তো! কালাপাহাড়ের শক্তি ছিল, ক্ষমতাও ছিল, সেইসঙ্গে অভিমান এবং অপমানবোধ প্রবল। ব্রাহ্মণরা ওঁকে ক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। এসব আমার শোনা কথা। এই জল্পেশের অনেক বৃদ্ধ মানুষ তাঁদের পিতা-পিতামহের কাছে শোনা কালাপাহাড়ের গল্প এখনও বলেন। তিনি এলেন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে। তাতে পাঠান যেমন আছে, তেমন এ-দেশের হিন্দুরাও। দেবাদিদেব নাকি তাঁকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন যে, তিনি মন্দিরের ভেতরে পা বাড়াতে পারেননি। তুমি থাকো কোথায়?"

"তোমাকে আমার কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কী দেওয়া যায়?" সন্ন্যাসীর মুখ থেকে কথা বের হওয়ামাত্র পাশের নারকোল গাছ থেকে একটা নারকোল খসে পড়লো মাটিতে ধুপ করে। সন্ন্যাসী সেটা কুড়িয়ে নিলেন, "বাঃ, এইটেই নাও। নাড়ু করে খেও।"

নারকোল হাতে ধরিয়ে সন্ন্যাসী চলে গেলেন। অর্জুন হতভম্ব। এটা কী হলো? একেই কি অলৌকিক কাণ্ড বলে? সে পুকুরের দিকে তাকালো। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল এবং শিবমন্দির। হরিপদ সেন যে জায়গাটার কথা বলেছিলেন তা তো জল্পেশ্বর হতে পারে। যদিও এখন চারপাশে কোনোও জঙ্গল নেই। কিন্তু পাঁচশো বছর আগে থাকতেও তো পারে। আর তখনই তার মনে পড়লো অমলদার সতর্কবাণী,প্রমাণ ছাড়া কোনোও সিদ্ধান্তে শুধু নির্বোধরাই আসতে পারে।

৪

কাল জলপাইগুড়িতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছিল। জল্পেশ্বর মন্দির দেখে ত্রিদিববাবু গিয়েছিলেন জটিলেশ্বর মন্দির দেখতে। ফলে দেরি হয়ে গেল বেশ। জটিলেশ্বর জল্পেশ মন্দির থেকে মাত্র চার মাইল দূরে। অথচ এর কথা শহরে এসে তেমন শোনা যায় না। শহরে ফিরে আসার সময় ত্রিদিববাবু বললেন, "জল্পেশ মন্দিরের আকৃতি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। দেখেছেন, মুসলিম সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে ওর নির্মাণে। অথচ মূল মন্দিরের কাছে বাসুদেব মূর্তি বা ক্ষয়ে যাওয়া গণেশ মূর্তি দেখলে বোঝা যায় পালবংশের সময়েই মন্দির তৈরি। তখন তো মুসলিম সংস্কৃতি এ-দেশে আসেনি।

অর্জুন কানখাড়া রেখেছিল। কালাপাহাড় এই মন্দিরের ক্ষতি করার পর যখন সংস্কার করা হয়েছিল তখনই কি ওই পরিবর্তন এসেছিল ?

ত্রিদিববাবুকে সে-কথা বলতে তিনি বললেন, এ-ব্যাপারে তাঁর কিছু জানা নেই।

রাত হয়ে গিয়েছিল বলেই সে অমলদার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। বাড়ি ফিরে দেখলো বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। রাস্তা থেকেই দেখলো কেউ একজন বসে আছেন। এখন মাঝে-মাঝেই তার কাছে মানুষজন সমস্যা নিয়ে আসেন। মা তাঁদের বসতে বলেন তার ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে। দরজায় দাঁড়াতেই সে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলো। চল্লিশের কোঠায় বয়স, শরীর একটু ভারী হলেও সুন্দরী না বলে পারা যায় না। জামাকাপড়ে এবং ভঙ্গিতে বেশ পয়সাওয়ালা ঘরের মহিলা বলেই মনে হয়।

ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি অর্জুন-বাবু?"

"হ্যাঁ।" কাঠের টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসলো সে।

"ও। আমি এক্সপেক্ট করিনি আপনি এতো অলপবয়সী।"

"বলুন, কেন এসেছেন?"

"আমি মিস্টার অমল সোমের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্রায় ঘণ্টাদেড়েক অপেক্ষা করছি।"

"আপনার সমস্যা কী?"

"হেমন্তীপুর চা-বাগানটা আমাদের। আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে বাগানে খুব গোলমাল হয়েছিল। শ্রমিক বিক্ষোভ, মারা-মারি। তখন বাগান বন্ধ করে দিতে হয়। এর পরে আমার স্বামী মারা যান। সমস্তটা বুঝে নিতে আমার সময় লাগে। তারপর সরকার এবং ইউনিয়নের সঙ্গে অনেক কথা বলে আমি বাগান খুলেছিলাম। অনেকদিন বন্ধ থাকায় লেবাররা কাজের জন্য অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছিলো। কিন্তু এই সময় বাগানে নানারকম রহস্যময় ঘটনা ঘটতে লাগলো।"

"কীরকম ঘটনা?"

"আমার বাগানের পাশে নীলগিরি ফরেস্ট। খুব গভীর জঙ্গল। কুলি লাইন ওইদিকেই। কাজের জন্য যখন কুলিরা ফিরে আসছে তখন পর-পর তিন রাত্রে তিনজন খুন হয়ে গেল। কে খুন করছে, কেন করছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

"পুলিশের বক্তব্য কী?"

"পুলিশ! কোনোও ক্লুই পাচ্ছে না তারা। অথচ আমার বাগানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যারা এসেছিল তাদের অনেকেই আমার বাগান ছেড়েছে। নতুন কাজের লোকের আসার সম্ভাবনা নেই। এমন চললে আমাকে বাধ্য হয়ে বাগান বিক্রি করে দিতে হবে। কিন্তু আমি সেটা চাইছি না। আমার স্বামীর পূর্বপুরুষেরা ওই বাগান তৈরি করেন। বুঝতেই পারছেন।"

"আপনার নাম?"

"মমতা দত্ত।"

"অমলদাকে ঘটনাটা বলেছেন?

"হ্যাঁ। উনি বললেন অন্য একটি কেস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আপনাকে পুরো ব্যাপারটা জানাতে। পুলিশের ওপর আমি পুরো ভরসা করতে পারছি না।"

"হৈমন্তীপুর চা-বাগানটা ঠিক কোথায়?"

"হাসিমারার কাছে।"

"দেখুন, এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না আপনাকে। আগামীকাল সকালে একটা কেস নিয়ে আলোচনা আছে। সেটা যদি না নেওয়া হয় তা হলে অবশ্যই আপনার ব্যাপারটা দেখবো। কিন্তু ওই কেস নেওয়া হলে একদম সময় পাবো না।"

মমতা দেবী খুবই বিমর্ষ হলেন। তিনি জানালেন তাঁর টেলিফোন এখনও চালু আছে এবং খবর যা হোক, তা অর্জুন কাল দুপুরের মধ্যেই জানিয়ে দেবে। অর্জুন অবাক হয়ে শুনলো ভদ্রমহিলা গাড়ি নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে মাঝপথে বাসে চেপে জলপাইগুড়িতে

এসেছেন, যাতে কেউ যদি অনুসরণ করতে চায় তা হলে বিভ্রান্ত হবে। আজ রাত্রে এখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে কাল সকালে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে যাবেন। তাঁর ধারণা প্রতিপক্ষ সবসময় নজর রাখছে। অর্জুন তাঁকে মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রিকশর ব্যবস্থা করলো। ভদ্রমহিলা যাওয়ার আগে বারংবার অনুরোধ করলেন তাঁকে সাহায্য করতে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অর্জুনের মনে হলো অতীতের পেছনে না ছুটে বর্তমানের সমস্যা সমাধান করা অনেক বেশি উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। কবে কখন কোথায় কালাপাহাড় তার লুটের সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছে এবং সেটা উদ্ধার করে হরিপদ সেনকে তুলে দিতে হবে—এমন অসম্ভব ব্যাপার নিশ্চয়ই অমলদা করতে চাইবেন না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অমলদা ভদ্রলোকের কাছে অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছেন। বেশির ভাগ কেসেই এটা উনি করেন না। অ্যাডভান্স নিলে কাজটা করবেন বুঝেই নেন। কালাপাহাড়ের সোনা খোঁজা মানে অন্ধকারে হাতড়ানো। হৈমন্তীপুর চা-বাগানের হত্যা রহস্যের তো একটা মোটিভ দেখা যাচ্ছে। মমতা দেবীকে বাগানছাড়া করা। ওই পথে এগোলে হত্যাকারীদের সন্ধান পেতে তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বাগানটা অনেকদিন বন্ধ ছিল। পাশেই নীলগিরি জঙ্গল। কুলিরা যখন আসতে শুরু করলো তখন তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশি ছিল না। তাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কোনোও দল যদি দু-চার-জনকে হত্যা করে আবার জঙ্গলে ফিরে যায় তা হলে আতঙ্ক ছড়াতে বেশি দেরি হবে না।

সকালে বাইক চালিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়েই অর্জুন অমল সোমের বাড়িতে চলে এলো। অমলদা এবং বিষ্টুসাহেব বাগানেই চেয়ার পেতে বসে চা খাচ্ছিলেন। বিষ্টুসাহেব চিৎকার করে বললেন, "সুপ্রভাত। কাল দুপুরের পর আর দর্শন পেলাম না কেন?"

ইতিমধ্যে হাবু তৃতীয় চেয়ারটি নিয়ে এলো। বসে পড়লো অর্জুন,

"কাল বিকেলে জল্পেশের মন্দিরে গিয়েছিলাম। আচমকাই।"

"জল্পেশের মন্দির? আহা, গেলে হতো সেখানে।" বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন।

অমল সোম বললেন, "গেলেই হয়। আছেন তো ক'দিন।"

অর্জুন দেখলো অমলদা এটুকু বলেই চুপ করে গেলেন। এটাই অস্বস্তিকর। কিন্তু বিষ্টুসাহেবই তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, "ওই যে, কাল এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, কোনোও চা-বাগানের মালিক যেন···।"

অর্জুন দেখলো অমলদা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে বললো, "হ্যাঁ, উনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আপনি কেসটা শুনেছেন অমলদা?"

"হ্যাঁ। ভদ্রমহিলার দুশ্চিন্তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

"আমরা কি কেসটা নিতে পারি?"

"সময় পাওয়া যাবে না।"

"কেন?"

"তুমি তো জানো, আজকাল সাধারণ ঘটনা আমাকে একদম টানে না। বরং ওই হরিপদ সেনের ব্যাপারটা ক্রমশ আমার কাছে খুব ইণ্টারেস্টিং হয়ে উঠেছে। ওঁর দেওয়া কাগজপত্তরগুলো পড়লাম। এই কেস নিয়ে কাজ করা যায়।"

অর্জুন বললো, "ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোলমেলে।"

"ঠিকই। তাই আমাকে টানছে। অর্জুন, তুমি কি মনে করো কালাপাহাড়ের মতো একজন ক্ষমতাবান লোক সবাইকে দেখিয়ে একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে সোনা-মুক্তো পুঁতে রাখবে? যখন তার জানাই আছে যুদ্ধের প্রয়োজনে কাশী থেকে কামাখ্যা ঘুরে বেড়াতে হয়? লোকটা নিশ্চয়ই তার নবাবকে লুকিয়ে ওগুলো সরাতে চেয়েছে! কালাপাহাড়কে এতটা বোকা আমার কখনওই মনে হয়নি।"

অর্জুনের একটু অস্পষ্ট ঠেকলো, "কিন্তু হরিপদবাবু বলে গেলেন যে

নন্দলাল সেন জানতেন কোথায় কালাপাহাড় ও সব লুকিয়েছেন।"

"কথাটা হরিপদবাবুকে তাঁর ছোটঠাকুর্দা বলেছেন। তিনিও নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বপুরুষদের মুখে শুনে থাকবেন। কথা হলো, এতদিন এঁরা চুপ করে বসে ছিলেন কেন? পুরী থেকে অনেক আগেই তো অভিযান করতে পারতেন ওঁরা।"

অর্জুনের মনে হলো অমলদা ঠিক কথাই বলছেন। বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "ওই কাগজপত্রে কিছু পেলেন?"

"হ্যাঁ। সেইটেই ইন্টারেস্টিং। ওগুলো আসলে নন্দলাল সেনের জীবনের বৃত্তান্ত। তাঁর নিজের লেখা নয়। যিনি লিখেছেন তিনি। কর্ণাটকী শব্দ জানেন। ইচ্ছে করেই হয়তো মানেটাকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কর্ণাটকী আমিও জানি না। যেটুকু বোঝা গেল তাতে নন্দলাল কালাপাহাড়ের পুরী অভিযানের পর একেবারে নিঃশব্দে সরে যান দল থেকে। হয়তো কালাপাহাড়ের অত্যাচার তাঁর আর সহ্য হয় নি। এই দল-ছাড়ার আগে তিনি অনুমতিও নেননি। কালাপাহাড় হয়তো নন্দলালের ওই ধৃষ্টতা মেনে নিতো না যদি তাকে জরুরি প্রয়োজনে পুরী থেকে চলে না আসতে হতো।"

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কালাপাহাড়ের সম্পর্কে সব কিছু জেনেছেন? মানে যেটুকু জানা সম্ভব?"

অমলদা হাসলেন, "খুব বেশি কিছু নয়। তুমি যা জেনেছ, তাই। গতকাল বিকেলে আমরা বেড়াতে-বেড়াতে তোমার মাস্টারমশাই-এর কাছে গিয়ে শুনলাম তুমি আমাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছ। ভদ্রলোক সারাজীবন ইতিহাস নিয়ে আছেন, অনেক কিছু জানেন। কিন্তু তাঁর জানাতেও বিস্তর অনুমান আছে।"

"আপনি কীভাবে কেসটা শুরু করবেন?"

"এখনও ভাবিনি। কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে।"

"কালাপাহাড়ের অতীত, মানে জন্মবৃত্তান্ত…!"

"এইখানে একটা কথা।" অমলদা হাত তুলে থামালেন, "ধরো, কোনোও

মানুষ খুন হলেন। অপরাধী কে সেটা আন্দাজ করতে পারছো। কিন্তু তার গতিবিধি জানবার জন্য কি তুমি তার বাল্যকাল হাতড়াবে?"

"না, তা নয়। কিন্তু তার অভ্যেস বা সংস্কার জানবার জন্য পেছনের দিকে হয়তো যেতে হতে পারে। আপনি বলছেন কালাপাহাড় কোনোও সাক্ষী রেখে ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখবে না। তা হলে নন্দলাল সেটা জানলেন কী করে? জানলেও নিজের অংশ নেননি কেন?"

"দুটো কারণ থাকতে পারে। কালাপাহাড় যে সম্পত্তি পরে ব্যবহার করবে বলে লুকিয়েছিল তা যদি নন্দলালের জানা থাকে তা হলে কালাপাহাড়ের মৃত্যুর পরেই ওঁর মনে হতে পারে এবার ওই সম্পত্তি বেওয়ারিশ, আর কেউ যখন জানে না তখন আমি ভাগ নিই। তা হলে ভাগ কেন? পুরোটাই তো নিতে পারতেন। মুঘল ফৌজের তোপে কালীগঙ্গার ধারে কালাপাহাড় মারা যায়। তবু হরিপদবাবুর দেওয়া কাগজপত্রে পাচ্ছি—নন্দলাল অংশের কথা বলছেন। কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ করে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে। ধরা যাক, তখনই বা তার কিছু পরে নন্দলাল দলত্যাগ করেন। এর প্রায় পনেরো বছর পরে কালাপাহাড় মারা যায়। ততদিন নন্দলাল পুরীতেই আত্মগোপন করে থাকতে পারেন। কিন্তু কালাপাহাড় মারা যাওয়ার পরে তো নিজেই যেতে পারতেন ধনসম্পদ উদ্ধার করতে!"

অমল সোম চোখ বন্ধ করলেন, "নন্দলাল যাননি। হয় তিনি অসুস্থ ছিলেন, নয় অন্য কারণ ছিল। নন্দলালের কথা যিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনিও অংশের কথাই বলেছেন। তা হলে কি আর কেউ নন্দলালের সঙ্গী ছিল?"

বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন, "বাঃ। চমৎকার। দুটো কারণ বলছিলেন, আর-একটা কী? একটা না হয় অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো সঙ্গীর জন্যই যেতে পারেননি ভদ্রলোক।"

অমলদা বললেন, "দ্বিতীয় কারণ খুব সোজা। কালাপাহাড়ের একার

পক্ষে অতো ধনসম্পদ লুকনো সম্ভব ছিল না। সেইজন্য বিশ্বস্ত অনুচর নন্দলালকে সঙ্গে নিয়ে সেটা করেছেন। তারপর হয়তো আশ্বাস দিয়েছিলেন কিছুটা অংশ পরে দেবেন। কিন্তু পুরীর মন্দির আক্রমণের পরে ভদ্রলোকের মনে অনুতাপ আসে। তিনি তাঁর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করেন। ওরকম মনের অবস্থায় লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তি সম্পর্কে মনে ঘৃণা জন্মানো অস্বাভাবিক নয়। তাই তিনি কালাপাহাড় মারা যাওয়ার পরেও উদ্ধারের চেষ্টা করেননি। কিন্তু ঘটনাটা ছেলে বা নাতিকে বলেছিলেন। তাঁরাই লেখার সময় ধনসম্পত্তির উল্লেখ করে নিজেদের অংশ দাবি করে বসে আছে। কিন্তু ততদিনে এ-দেশের রাজনৈতিক চরিত্র ঘন-ঘন বদল হচ্ছে। নন্দলালের বংশধরদের পক্ষে ইচ্ছে থাকলেও উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। আর নন্দলাল তাঁদের বিস্তারিত বলেও যাননি।"

এবার অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "এতো বছর পরে আমরা জায়গাটা বের করবো কী করে?"

অমলদা হাত নেড়ে হাবুকে ডাকলেন। ইশারায় কাপ-প্লেট তুলে নিতে বললেন। তারপর চোখ বন্ধ করলেন, "কালাপাহাড় কেন ধনসম্পত্তি লুকিয়েছিল? তার তো প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল। নিশ্চয়ই সে চায়নি ওগুলোর কথা অন্য লোক জানুক। এই অন্য লোক সম্ভবত বাংলার নবাব দাউদ খাঁ, কালাপাহাড় যাঁর সেনাপতি। অভিযান করে সেনাপতি যা লুঠ করবে তা অবশ্যই নবাবের প্রাপ্য। যতই প্রতাপশালী সেনাপতি হোক, নবাবের কাছে কালাপাহাড়কে জবাবদিহি করতেই হতো। কোনোও একটা অভিযান করে রাজধানীতে ফেরার পথে কালাপাহাড় ওগুলো লুকিয়ে রাখে। নন্দলালের বর্ণনা অনুযায়ী মনে হয় জায়গাটা এই উত্তরবঙ্গ। কারণ দাউদ খাঁর রাজধানী ছিল মালদহের তাণ্ডা নামে একটা শহরে। এবার ব্যাপারটা একটু সহজ হয়ে গেল। মালদহে ফেরার পথে উত্তরবঙ্গ যদি পড়ে তা হলে কালাপাহাড় অসম অভিযান করেই ফিরছিল এবং সেটা পুরী

অভিযান করার ঠিক আগে। তা হলে ওর ওই ফেরার পথ ধরে আমাদের এগোতে হবে।"

ঠিক এই সময় একটা জিপ এসে গেটের সামনে থামলো। অর্জুন দেখলো জিপ থেকে থানার দারোগা শ্রীকান্ত বক্সি নামছেন। সে এগিয়ে গেল। শ্রীকান্তবাবু গেট খুলে কাছে এসে বললেন, "মিস্টার সোম, আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এসেছি। স্রেফ রুটিন কাজ।"

অমলদা বললেন, "স্বচ্ছন্দে।"

"হরিপদ সেন গতকাল আপনার কাছে এসেছিলেন। কী কথা হয়েছে?"

"কী ব্যাপার ? আপনি আমার ক্লায়েণ্টের ব্যক্তিগত কথা জানতে চাইছেন কেন ?"

শ্রীকান্ত বক্সি গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, "আজ সকালে হরিপদবাবুকে তাঁর হোটেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ একটু আগে জানালো।"

অমলদা চমকে উঠলেন, "সে কী ! হরিপদবাবু মারা গিয়েছেন ?"

শ্রীকান্ত বক্সি মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। ওঁকে খুন করা হয়েছে।"

আক্ষেপে আকাশে হাত ছুঁড়লেন অমলদা, "ইস। ভদ্রলোককে বললাম জলপাইগুড়ির কোনোও হোটেলে থাকতে, কিন্তু কথাটা শুনতেই চাইলেন না।"

"আপনি কি ওঁর কথা শুনে কিছু আন্দাজ করেছিলেন ?"

"না। উনি আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেটা নেবো কি না তা ভাবতে একদিন সময় নিয়েছিলাম। ইন ফ্যাক্ট আপনার বদলে এখন হরিপদবাবুকেই আশা করছিলাম। আজ সকালে ওঁকে জানিয়ে দিতাম ওঁর প্রস্তাবে আমি রাজি। শিলিগুড়ি থেকে যাওয়া-আসা না করে আমি তাই ওঁকে জলপাইগুড়িতেই থাকতে বলেছিলাম।"

"উনি রাজি হননি ?"

"না, বললেন সেখানে জিনিসপত্র রেখে এসেছেন। অথচ… ।'

"উনি কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ?

হাত নাড়লেন অমলদা। খুব হতাশ দেখাচ্ছিল তাঁকে, "সেটা কি আমি বলতে বাধ্য?"

"হয়তো ওঁর খুনের কোনোও ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি। ইন ফ্যাক্ট, ওঁর হোটেলের ঘরে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছে যার জন্য শিলিগুড়ি পুলিশ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারে।"

অমলদা একটু চিন্তা করলেন, "উনি আমাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে গিয়েছিলেন, ওঁর কাগজপত্রও আমার কাছে। কিন্তু আমার সন্দেহ ওঁর কাছে আরও কিছু ছিল যা আমাকে বিশ্বাস করে দিতে পারেননি। যা হোক, ওঁকে যখন ক্লায়েন্ট বলে ভেবেছি তখন ওঁর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা আমার নৈতিক কর্তব্য। মিস্টার বক্সি, উনি আমার কাছে এসেছিলেন গুপ্তধন উদ্ধার করার সাহায্য চাইতে।"

"গুপ্তধন?" শ্রীকান্ত বক্সি হতভম্ব।

"আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পত্তি যা ঠিক কোথায় আছে তিনি জানেন না।"

"তা হলে খুঁজবেন কি করে?"

"সেই কারণেই ওঁর কাছে একদিন সময় চেয়েছিলাম।"

'আচ্ছা! তা হলে হত্যাকারী এই গুপ্তধনের খবর জানতো!"

"মনে হচ্ছে তাই।" অমলদা উঠে দাঁড়ালেন, "আমরা একবার শিলিগুড়িতে যেতে চাই। ওঁর হোটেলে। সাহায্য করবেন?"

"নিশ্চয়ই। আমিও যাচ্ছিলাম। আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন।"

"আপনি কেন যাচ্ছিলেন?"

"পুলিশের কাজ মশাই। ছুটোছুটিই তো আমাদের চাকরি।"

বিষ্টুসাহেব বাড়িতেই থেকে গেলেন। অর্জুন আর অমল সোম দারোগাবাবুর জিপে উঠে বসতেই চাকা গড়ালো। অর্জুনের মনে পড়লো গতকাল হরিপদবাবু এই সময় বেঁচে ছিলেন। এই বাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন। আজ তিনি নেই। কে সেই লোক যে একজন অংশীদার কমিয়ে দিলো?

৫

প্রচণ্ড শব্দ করে জিপটা নড়ে উঠে গড়াতে-গড়াতে থেমে গেল। হরিশ ড্রাইভার আফসোসের গলায় বললো, "পাংচার হো গিয়া।"

শ্রীকান্ত বক্সি জিজ্ঞেস করলেন, "স্টেপনি ঠিক আছে তো ?"

ড্রাইভার মাথা নাড়লো, "রিপেয়ারমে দিয়া থা, নেহি মিলা আজ।"

শ্রীকান্ত বক্সি খিঁচিয়ে উঠলেন,"এতো দায়িত্বজ্ঞানহীন কেন তোমরা ? স্টেপনি ছাড়া কেউ গাড়ি বের করে ?" তারপর অমলদার দিকে তাকিয়ে বললেন,"দেখুন তো কাণ্ড। এই সময় আমি যদি কোনোও ক্রিমিনালকে তাড়া করতাম, তা হলে কীরকম বোকা বনতাম ?"

অমলদার দেখাদেখি অর্জুনও জিপ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল। জায়গাটা শিলিগুড়ি থেকে বেশি দূরে নয় এবং একেবারে ফাঁকা মাঠের গায়ে তারা দাঁড়িয়ে নেই। কিছু একতলা ঘর-বাড়ি এবং একটি বড় দোকান চোখে পড়ছে। ওই দোকানের পান্তুয়া এ-অঞ্চলে

খুব বিখ্যাত। দোকানের সামনে একটি কালো অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। অমলদা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "এখান থেকে তো আর বাসে চড়া যাবে না, আগেরটায় যা অবস্থা দেখলাম, আপনাকে দেখে কেউ যদি লিফ্‌ট দেয় তা হলে মুশকিল আসান হতে পারে।"
শ্রীকান্ত বক্সি রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটা মারুতি আসছে। দারোগাবাবু হাত দেখালেন। মারুতি থামলো। তিনজন বসে আছেন ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে। আরোহীরা জানতে চাইলেন গাড়ি থামাবার কারণ। দারোগাবাবু কারণটা জানালেন। স্পষ্টতই বোঝা গেল একজন মানুষের জায়গা ওই গাড়িতে হতে পারে। অমলদা দারোগাবাবুকে বললেন আগে চলে যেতে। শিলিগুড়ির থানায় কথা বলে তিনি যেন সোজা হোটেলে চলে যান। শ্রীকান্ত বক্সির তেমন ইচ্ছে ছিল না কিন্তু অমলদা দ্বিতীয়বার বলার পরে আর আপত্তি করলেন না। মারুতি বেরিয়ে গেলে অমলদা বললেন, "এসো, একটু পান্তুয়া খাওয়া যাক।"
রাস্তায় আর কোনোও গাড়ি দেখা যাচ্ছিল না। ওরা পান্তুয়ার দোকানে ঢুকে দেখলো খদ্দের দু'জন। লোক দুটো চা খাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছে। কাঠের টেবিল-বেঞ্চির ফাঁক গলে অর্জুন বসতেই শুনলো অমলদা চারটে করে পান্তুয়া দিতে বললেন। ইদানীং অমলদা চায়ে পর্যন্ত নামমাত্র চিনি খান। চারটে পান্তুয়া অর্জুনের পক্ষেই বেশি বেশি হয়ে যাবে। কিন্তু সে কিছু বললো না।
দুটো বড় প্লেটে পান্তুয়া এলে জিভে জল এলো অর্জুনের। যেমন আকার তেমন লোভনীয় চেহারা। অমলদা প্রথমটা শেষ করে হঠাৎ দু'হাত দূরে বসা লোক দুটোকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা তো শিলিগুড়িতে যাচ্ছেন, তাই না?"
লোক দুটো কথা থামিয়ে এদিকে তাকালো। যার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে সে জিজ্ঞেস করলো "কী করে বুঝলেন?" লোকটার ঠোঁটে

তখন সিগারেট চাপা রয়েছে।

"গাড়িটা তো আপনাদের ?"

ফ্রেঞ্চকাট বাইরে দাঁড় করানো গাড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা নাড়লো, "হ্যাঁ।"

"ওটা শিলিগুড়ির দিকে মুখ করে আছে, শিলিগুড়ি থেকে এলে উলটোমুখো থাকতো।"

ফ্রেঞ্চকাট হাসলো, "বাঃ, আপনার নজর তো খুব। হ্যাঁ, শিলিগুড়িতেই যাচ্ছি। কিন্তু কেন ?"

অমলদা বললেন, "এখান থেকে বাসে ওঠা যায় না, একটু লিফ্‌ট চাইছি।"

এবার দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "ওই পুলিশের জিপটাতে আপনারা ছিলেন না ?"

"হ্যাঁ। লিফ্‌ট নিচ্ছিলাম, খারাপ হয়ে গেল।"

"আপনারা পুলিশ ?"

"না, না। বললাম না, লিফ্‌ট নিচ্ছিলাম।"

ফ্রেঞ্চকাট কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটি বললো, "ঠিক আছে, হিল ভিউ হোটেলের সামনে নামিয়ে দেবো।"

"বাঃ, তাতেই হবে।"

কথাবার্তা শুনতে-শুনতে অর্জুনের পান্তুয়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অমলদা দ্বিতীয়টিতে আর চামচ বসাননি। অর্জুনের প্লেট খালি দেখে ইশারা করলেন বাকি তিনটে সে খেতে পারে। অর্জুন মাথা নাড়লো, "অসম্ভব। আমার পেট ভর্তি হয়ে গিয়েছে।"

অমলদা উঠে দাঁড়ালেন। আটটা পান্তুয়ার দাম মিটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অর্জুনও চলে এলো তাঁর সঙ্গে। লোক দুটোর যেন চা খাওয়া শেষ হচ্ছিলো না।

হঠাৎ অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "অর্জুন, তোমার কী মনে হয়,

হরিপদবাবু কেন খুন হলেন ?"

"যে লোকটা শাসিয়েছিল সে-ই খুন করেছে।"

"কিন্তু কেন ?"

"ওই সম্পত্তির লোভে।"

"কিন্তু তুমি যাকে সম্পত্তি বলছো তা কোথায় আছে কেউ জানে না। হরিপদবাবুকে খুন করে খুনি এখনই লাভবান হচ্ছে না। তাই না ?"

"হয়তো হরিপদবাবু কিছু জানতেন, যা জানলে খুনি কালাপাহাড়ের সম্পত্তি খুঁজে পেতে পারে। কিংবা ও'রা দুজনেই একটা সূত্র জানতেন। খুনি হরিপদবাবুকে সরিয়ে দিয়ে নিজের খোঁজার পথ নিষ্কণ্টক করলো।"

"তা হলে আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসে হরিপদবাবু সূত্রটা বললেন না কেন ? আমাদের ওপর তিনি আস্থা রাখতেই চেয়েছিলেন।"

"হয়তো প্রথম আলাপেই বলতে চাননি। এমন হতে পারে আজ এলে বলতেন।"

উঁহু। এতো হয়তোর ওপর নির্ভর করা চলে না। তা হলে খোঁজার পথটা গোলকধাঁধা হয়ে যাবে। আরও স্পেসিফিক কিছু বলো।"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল, "এখনই কিছু মাথায় আসছে না।" অমলদা গাড়িটার সামনে এগিয়ে গেলেন। গাড়ির ডিকির ওপর কাঁচা হাতে কেউ এস. আই. এল. লিখেছে। হয়তো কোথাও পার্ক করা ছিল, কোনোও বাচ্চাছেলে আঙুলের ডগায় অক্ষর তিনটে লিখেছিল। এখন তার ওপর আরও ধুলো পড়ায় বেশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। অমলদা বললেন, "গাড়িটা গতকাল শিলিগুড়িতে ছিল। আজ যদি জলপাইগুড়ি থেকে আসে তা হলে বুঝতে হবে ভোরেই শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়েছিল।

অর্জুন বুঝতে পারছিল না অমলদা হঠাৎ এই গাড়ি নিয়ে এতো

চিন্তিত হয়ে উঠলেন কেন ! তার মনে হলো আজকাল অমলদা অকারণে সব ব্যাপার মাথায় নেন ।

এই সময় লোক দুটো বেরিয়ে এলো । চারপাশে তাকিয়ে দেখে দ্বিতীয়জন স্টিয়ারিং-এ বসলো । পেছনের দরজা খুলে দিয়ে ফ্রেঞ্চ-কাট সামনের আসনে গিয়ে কাঁচ নামাতে লাগলো । অমলদার পাশা-পাশি পেছনের সিটে বসে অর্জুন দেখলো দ্বিতীয় লোকটির বাঁ কান একটু ছোট । লতি প্রায় নেই বললেই চলে ।

গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করলো "আপনারা শিলিগুড়িতে কাজে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ ।" অমলদা স্বাভাবিক গলায় বললেন, "ব্যবসার কাজে ।"

"কিসের ব্যবসা ?"

"বিনা মূলধনে যা করা যায় !"

"স্ট্রেঞ্জ ! মূলধন ছাড়া ব্যবসা কবছেন ? উকিল-ডাক্তারদেরও তো এক সময় কয়েক বছর খরচা করতে হয় ডিগ্রি পেতে । জলপাইগুড়িতেই থাকেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ । কয়েক পুরুষ ।"

এবার ফ্রেঞ্চকাট বললো, "কলকাতায় বাস করে জানতামই না যে, জলপাইগুড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এতো বেশি । আমার তো বেশ ভালো লাগছে ।" কথাগুলো বলেই সিগারেট ধরালো ।

দ্বিতীয় লোকটি হাসলো, "শিলিগুড়ির নেই ভাবছেন ? এই যে শিলিগুড়ি, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম ? শিলিগুড়ি নামটা কী করে হলো ? লেপচাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের লড়াই । সেই ভয়ংকর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে লেপচারা পাহাড় থেকে নেমে সমতলে শিবির গেড়েছিল । পরাজিত হয়েও ব্রিটিশরা আবার সৈন্য জোগাড় করে যখন ফিরে আসছে তখন একজন লেপচা সেনাপতি চিৎকার করে আদেশ দিলেন, 'শ্যালিগ্রি' । শ্যালিগ্রি লেপচা শব্দ । মানে ধনুকে ছিলা পরাও । এই শ্যালিগ্রি থেকে শ্যালগিরি এবং শেষ পর্যন্ত

শিলিগুড়ি ”

অর্জুনের মজা লাগছিল। জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির লোকেরা পরস্পরকে সব সময় একটু নীচে রাখাতে ভালবাসে। এ-ব্যাপারে বেশ রেষারেষি আছে অনেকদিন ধরেই। জলপাইগুড়ির লোকের চেষ্টায় শিলিগুড়ির মুখে বিশাল রেল স্টেশন তৈরি হলেও তাই নাম রাখতে হলো নিউ জলপাইগুড়ি। এই দ্বিতীয় লোকটি নিশ্চয়ই শিলিগুড়ির অনেকদিনের বাসিন্দা। ফ্রেঞ্চকাট তো নিজেকে কলকাতার লোক বললোই। কয়েক মিনিটেই রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল। হিল ভিউ হোটেলের সামনে গাড়িটা থামলে অমলদা নেমে পড়ে অনেক ধন্যবাদ দিলেন ড্রাইভার ভদ্রলোককে। তিনি মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

একটা রিকশা নেওয়া হলো। শিলিগুড়িকে রিকশার শহর বললে ভুল বলা হবে না। প্রায় গায়ে-গায়ে অতি দ্রুত গতি নিয়ে রিকশাগুলো যেভাবে ছুটোছুটি করে তাতে হৃৎপিণ্ড ধড়াস-ধড়াস করে। মহানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে অমলদার পাশে বসে অর্জুন হোটেলের দিকে চলেছিল। অমলদা বসে আছেন গম্ভীর মুখে। বাঁ দিকে নতুন তৈরি বাস টার্মিনাল এখন ফাঁকাই বলা যায়। আর-একটু গেলেই সিনক্লেয়ার হোটেল, তারপরেই দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা, অর্জুনদের অত দূরে যেতে হলো না। ডান দিকের একটা সাধারণ হোটেলের সামনে অমলদা রিকশা থামালেন। হোটেলটির দরজায় দুটো সেপাই দাঁড়িয়ে আছে লাঠি হাতে। ভাড়া মিটিয়ে রিকশা ছেড়ে দিয়ে অমলদা এগিয়ে যেতেই অর্জুন অনুসরণ করলো।

হোটেলে ঢোকার মুখে সেপাইরা বাধা দিলো। একজন বললো, “হোটেল বন্ধ আছে।”

“আমরা জলপাইগুড়ি থেকে আসছি। শিলিগুড়ির ও. সি. সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।”

"তা হলে থানায় যান। আমাদের ওপর অর্ডার আছে কাউকে ঢুকতে না দেওয়ার।"

"ম্যানেজারবাবু আছেন ?"

"না। ওঁকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

অমলদা অর্জুনের দিকে তাকালেন, "এখানেও একই সমস্যা। বিশল্য-করণীর জন্য গোটা গন্ধমাদন পর্বত তোলা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। শ্রীকান্ত বক্সি এসে পড়েছেন।"

অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো শ্রীকান্ত বক্সি একটা পুলিশের জিপ থেকে নামছেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন অফিসার নেমে এলেন। লোকটি রোগাটে, চোয়াল বসা, মাথার চুল অল্প, পঞ্চাশের ওপর বয়স। ইনিই সম্ভবত শিলিগুড়ির ও. সি.। এমন চেহারার মানুষ খুব সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হন।

"আপনারা কিসে এলেন ?" শ্রীকান্ত বক্সি জিজ্ঞেস করলেন।

"দুই ভদ্রলোক অনুগ্রহ করে পেঁাছে দিলেন।" অমলদা সহাস্যে জবাব দিলেন!

"আপনিই বোধহয় এখানকার ও. সি. ? আমার নাম অমল সোম, এই ছেলেটির নাম অর্জুন।"

শ্রীকান্তবাবু বললেন, "আপনি আমাদের তলব করেছেন। নিশ্চয়ই কথা বলবো, কিন্তু তার আগে আমরা কি সেই ঘরটিতে যেতে পারি যেখানে হরিপদবাবু খুন হয়েছেন ?"

শিলিগুড়ির দারোগা বললেন, "কেন যেতে চাইছেন ওখানে ?"

"হরিপদবাবু আমার ক্লায়েন্ট ছিলেন।"

"হুম। শ্রীকান্ত, তুমি কী বলো ?" শিলিগুড়ির ও. সি. এবার মুখ ফেরালেন।

শ্রীকান্ত বক্সি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "মিস্টার সোম সাহায্য করলে এই কেস দু'দিনেই সলভ্ড হয়ে যাবে রায়দা। তা ছাড়া উনি যা বলছেন তা করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে।"

"যুক্তিসঙ্গত মানে ? উনি গোয়েন্দা হতে পারেন কিন্তু এই কেসে উনি একজন···মানে, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো ! চলুন ওপরে। তবে আমিও সঙ্গে থাকবো।" শিলিগুড়ির ও. সি., যাঁর পদবি রায়, হাত নেড়ে সেপাইদের সরে যেতে বললেন।

৬
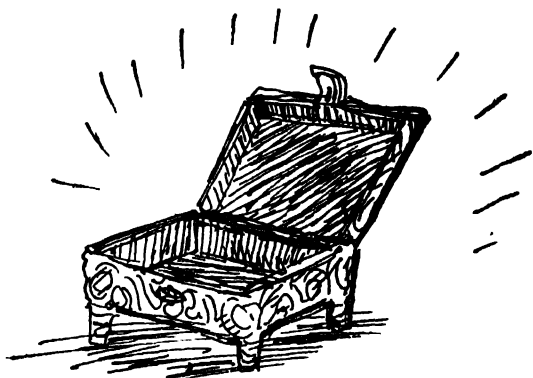
দোতলার যে ঘরটিতে হরিপদবাবু ছিলেন তার দরজায় তালা দেওয়া। হোটেলে কোনোও লোকজন নেই। এমনকি কর্মচারীদেরও দেখা যাচ্ছে না। রায়বাবুর পকেটে চাবি ছিল। তিনিই দরজা খুললেন। জানলা বন্ধ। তাই আলো জ্বালা হলো প্রথমে। শ্রীকান্ত বক্সি জানলা খুলে দিলেন। মাঝারি আকারের ঘর। মাঝখানে একটা ডাবলবেড, চাদর ছাড়া। টেবিলে কিছু কাগজপত্র, ব্যাগ ছড়ানো আছে। অমলদা বললেন, বডি নিয়ে যাওয়ার পর ভালো করে খুঁজে দেখা হয়েছে?"

রায়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী খুঁজবো? ক্লু? কোনোও দরকার নেই। লোকটা ওই দরজা দিয়েই ঢুকেছিল। হরিপদ সেন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন। চুপচাপ ভেতরে ঢুকে সোজা ওঁর পিঠে দশ ইঞ্চি শার্প সরু ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। কাজ শেষ করে ওই দরজা দিয়েই চলে গেছে।"

অমলদা চট করে শ্রীকান্ত বক্সির দিকে তাকালেন। তিনি তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। অমলদা বললেন, "এ-কথা তো আপনি আমাকে জলপাইগুড়িতে বলেননি ?"

"আমি তো তখন পুরো ঘটনাটা জানতাম না।"

অমলদা একটু ভাবলেন, "ভদ্রলোক, মানে খুনি ওই দরজা দিয়ে ঢুকলেন কী করে ? হরিপদবাবু কি দরজা বন্ধ করে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন ?"

"ঠিক তাই।" রায়বাবু বললেন, "অনেক লোক হোটেলে এলে ও কেয়ারলেস হয়ে থাকে।"

মাথা নাড়লেন অমলদা, "হরিপদবাবুর সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আলাপ হলেও আমি জোরগলায় বলতে পারি, তিনি দরজা খুলে ওইভাবে শুয়ে থাকার মানুষ নন।"

রায়বাবু একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে খুনি ঢুকলো কী করে ?"

"সেটা নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে।" কথাগুলো বলতে-বলতে অমলদা পুরো ঘরটা একবার পাক মেরে এলেন। তাঁর নজর ঘরের মেঝের ওপর ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেওয়াল আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ঘরের সমস্ত হাতের ছাপ নিয়ে নিয়েছেন মিস্টার রায় ? নিলে আমি আলমারিটা খুলতে পারি। আমাকে যখন একজন পার্টি করেছেন তখন এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হচ্ছে।"

রায়বাবু বললেন "ফিঙ্গার প্রিন্টের লোককে সন্ধের আগে পাওয়া যাচ্ছে না।"

অমলদা বললেন, "তা হলে রুমাল ব্যবহার করছি।"

পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে ডান হাতে নিয়ে তার আড়ালে আঙুল ঢেকে আলমারি খুললেন অমলদা। হ্যাঙারে এক-জোড়া শার্ট-প্যান্ট ঝুলছে। নীচের তাকে একটা খোলা ফাইল। ফাইলটা

সম্ভবত সাদা ফিতেয় বাঁধা ছিল। ফিতেটা ছেঁড়া। হাঁটু গেড়ে বসে ফাইলের কাগজপত্র দেখতে-দেখতে অমলদা বললেন, "একেবারে লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়ে গেছে। অর্জুন, তুমি ততক্ষণে বাথরুমটা দেখে এসো।"

রায়বাবুকে অমলদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে অর্জুন বাঁ দিকের দরজা ঠেলে বাথরুমে ঢুকলো। শুকনো বাথরুম। একটা নীল তোয়ালে ঝুলছে। আয়নার নীচে নতুন সাবানকেসে অল্প ব্যবহার করা সাবান ছাড়া আর কিছু নেই। বাথরুমে কোনোও সন্দেহজনক জিনিস চোখে পড়লো না। সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো অমলদা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ার। একটা সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ে আছে। মাঝখানের অ্যাস-ট্রেতে গোটা দুয়েক সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। অমলদা বললেন, "মিস্টার রায়, পোস্টমর্টেম যিনি করবেন তাঁকে বলবেন যেন পরীক্ষা করে দ্যাখেন হরিপদবাবুর সিগারেটের নেশা ছিল কি না। এটা খুব কড়া সিগারেট। শখে পড়ে যারা সিগারেটা খায়, তাদের পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়।"

রায়বাবু অ্যাসট্রেটাকে সযত্নে সরিয়ে রাখলেন। অর্জুন দেখলো ভদ্রলোকের চোখ-মুখের পরিবর্তন হয়েছে। বেশ সম্ভ্রমভাব ফুটে উঠেছে। টেবিলে আর কিছু পেলেন না অমল সোম। কিন্তু টেবিলের নীচে ঝুঁকে কিছু-একটা দেখেই সোজা হলেন। চারপাশে আর-এক-বার নজর বুলিয়ে বললেন, "আপনি বললেন এ-ঘরের কোনোও জিনিসে হাত দেওয়া হয়নি, তাই না?"

"নিশ্চয়ই।" রায়বাবু মাথা নাড়লেন।

"হরিপদবাবুর চটি কিংবা জুতো কোথায়?"

এতক্ষণে খেয়াল হলো অর্জুনেরও। এতক্ষণ শুধু সে লক্ষ্য করছিল খুনি কোনোও ক্লু রেখে গিয়েছে কি না। সে-কারণেই হরিপদবাবুর ব্যবহৃত জিনিসের প্রতি নজর ছিল না।

ঘরের কোথাও ভদ্রলোকের চটি বা জুতো খুঁজে পাওয়া গেল না।
অমলদা বললেন,"ব্যাপারটা তো খুবই অস্বাভাবিক। খুনি ওঁকে খুন করে যেতে পারে কিন্তু চটি বা জুতো নিয়ে যাবে কেন? গতকাল আমি হরিপদবাবুর পা দেখেছি। এমন কিছু মূল্যবান বস্তু ছিল না। আর ভদ্রলোক নিজে ওই প্রয়োজনীয় জিনিস দুটো বাইরে ফেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবেন এটা ভাবা যাচ্ছে না।"
রায়বাবু বললেন, "সত্যি তো, ওগুলো গেল কোথায়?"
অমলদা বললেন, "আপনার লোকজনকে বলুন একটু খুঁজে দেখতে। এই হোটেলের আশেপাশে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরের ডাস্টবিন বা রাস্তা থেকে যারা বাতিল জিনিসপত্র কুড়োয়, তাদের জানিয়ে রাখুন।"
অমলদা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "হোটেলের কর্মচারীদের জেরা করে কিছু জানতে পারলেন?"
রায়বাবু মাথা নাড়লেন "ডিটেলসে জিজ্ঞেস করিনি। এমনিতে সবাই বলছে কেউ কিছু জানে না"
"আমি একটু কথা বলার সুযোগ পাবো?"
"তা হলে তো আপনাকে হোটেলে যেতে হয়।"
"যেতে তো হবেই। আপনি আমাদের জেরা করবেন বলেছিলেন।"
রায়বাবু জিভ বের করলেন,"ছি-ছি। ওভাবে বলবেন না। হরিপদবাবুকে জীবিত অবস্থায় আপনি দেখে ছিলেন, উনি হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কীভাবে জলপাইগুড়িতে গিয়ে আপনাকে মিট করবেন, তাই আপনার একটা স্টেটমেণ্ট নেওয়া আমার কর্তব্য।"
"সেটা অবশ্যই নেওয়া উচিত।"
হোটেলটিকে আবার তালাবন্ধ করে রায়বাবু ওঁদের নিয়ে জিপে উঠলেন। রাস্তায় কোনোও কথা হলো না। থানায় গিয়ে রায়বাবু

ওঁদের সমাদর করে বসালেন। নিজের চেয়ারে বসেই পুলিশি গলা ফিরে পেলেন যেন,"হরিপদ সেনকে আপনি আগে চিনতেন ?"

"না কস্মিনকালেও নয়।" অমলদা মাথা নাড়লেন।

"উনি সেই কলকাতা থেকে আপনার কাছে কেন এলেন ?"

"গুপ্তধনের খোঁজে।"

"মানে ?" রায়বাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"ওঁর পূর্বপুরুষ কালাপাহাড়ের সহচর ছিলেন। কালাপাহাড় উত্তর বাংলার কোথাও অনেক সোনা-হিরে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন। ওঁর পূর্বপুরুষ সেটা জানতেন। হরিপদবাবু চেয়েছিলেন আমরা সেটা উদ্ধার করে দিই। এই অনুরোধই তিনি করেছিলেন।"

"কোথায় ওগুলো পোঁতা হয়েছিল তিনি আপনাকে জানিয়েছিলেন ?"

"না। তিনি জানতেন না।"

"স্ট্রেঞ্জ ! উত্তর বাংলার কোথায় খুঁজবেন আপনি ? পাগল নাকি ?"

"তবু আমি কেসটা নিয়েছিলাম। এ-ব্যাপারে ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে সাহায্য পেতাম।"

"দেখুন মিস্টার সোম, আপনার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"প্রথমত গল্প নয়, ঘটনা। বিশ্বাস করানোর দায়িত্ব আমার নয়।"

"বেশ। তারপর কী হলো ?"

"আমি ওঁকে আজ দেখা করতে বলেছিলাম।"

"উনি শিলিগুড়িতে থাকতে গেলেন কেন ? জলপাইগুড়িই তো ভালো ছিল।"

"সে-কথা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন শিলিগুড়িতেই উনি ভালো থাকবেন। মনে হচ্ছে, মানে এখন অনুমান করছি, শিলিগুড়িতে কারও সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক ছিল, যেটা আমাকে বলেননি।"

কার সঙ্গে ?"

"সম্ভবত যে লোকটি ওঁকে খুন করেছে তার সঙ্গেই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল।"

হঠাৎ রায়বাবুর যেন কিছু মনে পড়লো। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"হরিপদবাবুর পূর্বপুরুষ কার সহচর বললেন ?"

অমলদা বললেন,"কালাপাহাড়।"

"অদ্ভুত ব্যাপার ? কালাপাহাড় মানে সেই ঐতিহাসিক চরিত্র ?"

"হ্যাঁ।"

রায়বাবু উঠে একটা আলমারির পাল্লা খুললেন। বাঁ দিকের তাক থেকে একটা খাম বের করে তা থেকে একটা কাগজ টেনে আনলেন। বেশ রহস্যময় মুখ করে এগিয়ে এসে কাগজটাকে টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন।

একটা প্যাডের পাতার গায়ে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। পাতাটা কোঁচকানো। বোঝা যাচ্ছে ওই কাগজ দিয়ে কিছু মোছা হয়েছিল। প্যাডের পাতায় কেউ অনেকবার "কালাপাহাড়' শব্দটা লিখে গেছেন নানান ঢঙে। তার ওপর শুকনো রক্ত চাপা পড়েছে।

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন,"এই কাগজটাকে কোথায় পাওয়া গিয়েছে ?

"হরিপদবাবুর শরীরের ওপরে।"

"আপনি তখন যে বললেন ঘরের কোনোও জিনিস সরানো হয়নি ?"

"এটাকে জিনিসের মধ্যে ধরিনি। আমি কিন্তু হরিপদবাবুর ব্যবহৃত জিনিসের কথা বলেছিলাম।"

"ছুরিটা কোথায় ?"

"ছুরি ?"

"যেটা দিয়ে ওঁকে খুন করা হয় ?"

"সেটা তো খুনি নিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এই কাগজটা দিয়েই ছুরি মুছেছে।"

"এখনও পোস্টমর্টেম হয়নি। আপনি কী করে তখন বললেন দশ

ইঞ্চির ছুরি ছিল ?"

"এতদিন পুলিশের চাকরি করছি, উন্ড দেখে আন্দাজ করতে পারবো না ?"

চুপ করে রইলেন অমলদা খানিক। তারপর বললেন, "প্যাডের কাগজটা অবশ্যই হরিপদবাবুর। খুনি ছুরি মুছতে প্ল্যান করে পকেটে কাগজ নিয়ে আসবে না। কিন্তু ঘরের কোথাও আমি প্যাড দেখতে পাইনি। সেটা গেল কোথায়।"

রায়বাবু মাথা নাড়লেন, "ঠিক কথা ! এটা আমার মাথায় আসেনি।"

শ্রীকান্ত বর্কসি এতক্ষণ বেশ চুপচাপ শুনছিলেন। এবার বললেন, "আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম অমলবাবুর এ-ব্যাপারে দারুণ মাথা খোলে।"

অমলদা হাত নাড়লেন, "আমাকে কি আর কোনোও প্রশ্ন করবেন।

"না। তবে, হ্যাঁ। আপনি কালাপাহাড়ের নাম বললেন। ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু এই কাগজে সেই নামটা লেখা থাকবে কেন ?"

"হয়তো হরিপদবাবু লিখেছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে।" অমলদা হাসলেন, "মাথায় যেটা ঢোকে সেটা আমরা অনেকেই অন্যমনস্ক অবস্থায় কলমে ফুটিয়ে তুলি। তবে দেখতে হবে ওই কাগজের রক্ত এবং হাতের লেখা হরিপদবাবুর কি না।"

"রক্তটা ওঁর কি না বের করতে অসুবিধে হবে না। হাতের লেখা মেলাবো কী করে ?"

"হোটেলের খাতায় নিশ্চয়ই ওঁর হস্তাক্ষর পাওয়া যাবে। তাকিয়ে দেখুন বাংলার সঙ্গে ইংরেজি অক্ষরেও কালাপাহাড় লেখা হয়েছে। ক্যাপিটাল লেটারে যখন নয় তখন লেখাতে কিছুটা মিল পাওয়া যাবেই। যাক, এবার আমাকে হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন।" অমলদা উঠে দাঁড়ালেন।

৭
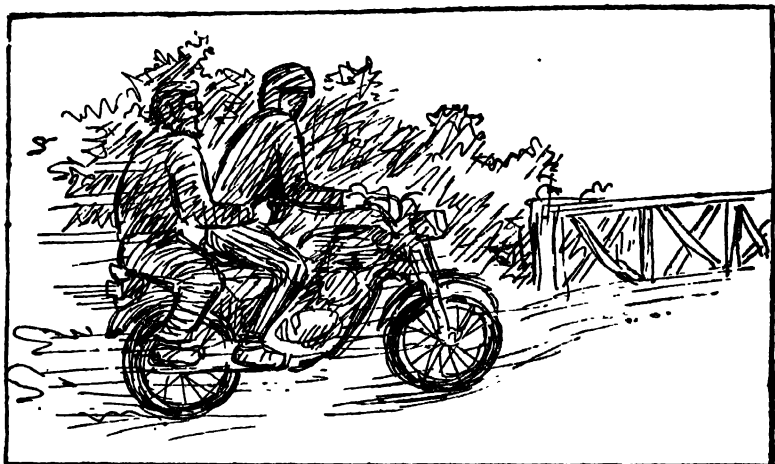
হোটেলের যেসব কর্মচারীকে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল অমল সোম তাদের জেরা করলেন। গতকাল হরিপদবাবুর কাছে কারা এসেছিলেন, হরিপদবাবুর ঘর থেকে কোনোও আওয়াজ শোনা গিয়েছিল কিনা, মৃতদেহ কীভাবে আবিষ্কৃত হলো ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর যা পাওয়া গেল তাতে কোনোও কাজ হলো না। লোকগুলো এত ভয় পেয়েছে যে, কোনোও কথাই বলতে চাইছে না। কিংবা ওদের কিছুই বলার নেই। হত্যাকাণ্ড সকলের অগোচরে ঘটে গেছে। অর্জুনেরও মনে হলো এমনটা ঘটা অসম্ভব নয়। হত্যাকারী সবাইকে জানিয়ে নিশ্চয়ই হরিপদবাবুর ঘরে ঢুকবে না।

থানার বড়বাবুর ঘরে ফিরে এসে অমলদা ঘড়ি দেখলেন। তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন,"তুমি কি মিসেস দত্তকে কোনোও কথা দিয়েছ?"

মিসেস দত্ত ! অর্জুন ঠাওর করতে পারলো না। তার অবাক-হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে অমল সোম বললেন,"হৈমন্তীপুর চা-বাগানের এখন যিনি মালিক।"

সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল অর্জুনের। ভদ্রমহিলাকে আজ দুপুরের মধ্যেই জানানোর কথা হয়েছিল কেসটা নেওয়া হবে কিনা। কিন্তু সকাল থেকে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগলো যে, ওঁর কথা মাথায় ছিল না। অর্জুন অমল সোমের দিকে তাকালো। হৈমন্তীপুর চা-বাগানের কেসটা অমলদা নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন তাকে। তা হলে হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ তুললেন কেন ? সে বললো, "আমরা তো ওর কেস নিচ্ছি না, তাই না ?"

অমলদা কথা শেষ করার ভঙ্গিতে বললেন,"সেটাও তো ওঁকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। তুমি একটা ফোন করে ওঁকে জানিয়ে দাও।"

দু'জন পুলিশ অফিসার চুপচাপ শুনছিলেন কথাবার্তা। শ্রীকান্ত বক্সি হাত বাড়িয়ে টেবিলের কোণে রাখা টেলিফোন দেখিয়ে দিলেন। শিলিগুড়ি থেকে হৈমন্তীপুর চা-বাগানে টেলিফোনে কথা বলতে হলে জলপাইগুড়ি এক্সচেঞ্জ হয়ে লাইন পেতে হবে। সেসব চেষ্টা করে যখন হৈমন্তীপুর চা-বাগানের কাছের টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে পাওয়া গেল তখন অর্জুন জানতে পারলো মিসেস দত্তের বাংলো বা ফ্যাক্টরির টেলিফোন কোনোও সাড়া দিচ্ছে না। সেখানকার অপারেটার জানালেন হৈমন্তীপুর চা-বাগানের টেলিফোন লাইন কাজ করছে না। রিসিভার নামিয়ে রেখে অর্জুন অমল সোমকে ঘটনাটা জানালো।

অমল সোম গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর শ্রীকান্ত বক্সির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার এলাকা যদিও নয় তবু আপনি কি হৈমন্তীপুর টি এস্টেটের ব্যাপারটা জানেন ?"

শ্রীকান্ত মাথা নাড়লেন, "শ্রমিক বিক্ষোভে বন্ধ ছিল। শেষপর্যন্ত বাগানটা খোলা হয়েছে বলে শুনেছি। কাল জানলাম দু-একটা খুন হয়েছে সেখানে।"

"পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না ?"

শ্রীকান্ত বক্সি হাসলেন, "পুলিশ তো ম্যাজিসিয়ান নয়। নিশ্চয়ই খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। কোনোও-কোনোও সমস্যার তো চট করে সমাধান হয় না।"

অমল সোম এবার অর্জুনকে বললেন, "ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগছে না। তুমি এখনই হৈমন্তীপুরে চলে যাও। ভদ্রমহিলা যেসব আশংকা করছিলেন তাই ঘটতে শুরু হয়েছে। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাও করা হতে পারে। তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে ?"

আজ অর্জুনের পকেটে টাকা ছিল না। সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বের হয়নি। অমল সোম তাকে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন, "এদের কাছে তো কিছুই জানা গেল না তাই শিলিগুড়ি থেকে ফিরতে আমার সন্ধে হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলাকে খবরটা দিয়েই তুমি জলপাই-গুড়িতে ফিরে যেয়ো।" অমল সোম পুলিশ অফিসারদের দিকে ঘুরে তাকালেন, "আমরা কি এবার একটু চা খেতে পারি ?"

অর্জুন থানা থেকে বেরিয়ে এল। হরিপদ সেনের হত্যারহস্য খুব সহজে সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে না। অমলদার মুখ দেখে মনে হলো তিনি এখন পর্যন্ত অন্ধকারেই আছেন। আর যেহেতু হরিপদ-বাবু আগাম টাকা দিয়ে গিয়েছেন তাই এই রহস্য সমাধান না করা পর্যন্ত অমলদা গম্ভীর থাকবেন। কিন্তু অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না এইভাবে তাড়াহুড়ো করে অমলদা তাকে কেন হৈমন্তীপুরে পাঠাচ্ছেন ? ভদ্রমহিলাকে সে বলেছিল আজকে জানাবে। সেটা আগামীকাল হলে এমন কিছু ক্ষতি হতো না। হৈমন্তীপুরে না গিয়ে অমলদার সঙ্গে শিলিগুড়িতে থেকে হরিপদবাবুর আসামিকে খুঁজে বের করার চেষ্টাতেই অনেক বেশি আনন্দ ছিল ! কালাপাহাড়ের উত্তরাধিকারী নবীন কালাপাহাড়ের মোকাবিলা তো এখানেই হবে। অর্জুন ঘড়ি দেখলো। এখন সেবক-মালবাজার হয়ে হাসিমারা দিয়ে

হেমন্তীপুর পেঁছে আর ফেরার বাস পাওয়া যাবে না। সন্ধের মুখেই ওদিকে বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অর্জুন ঠিক করলো মিনিবাসে জলপাইগুড়ি ফিরে গিয়ে তার নিজের মোটর বাইক নিয়ে হেমন্তীপুরে যাবে। একটু এগিয়ে সে দেখলো থানার কাছে মিনিবাস স্ট্যান্ডে কোনোও বাস নেই। দেরি করা চলবে না বলে সে রিকশা নিয়ে চলে এলো শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি হাইওয়েতে। এবং তখনই একটা ধাবমান ট্যাক্সি থেকে কেউ বিকট গলায় 'অর্জুন' বলে চিৎকার করে উঠলো।

অবাক হয়ে অর্জুন দেখলো একটা ওয়াই মার্কা অ্যাম্বাসাডার কোনোও মতে ব্রেক কষতে-কষতে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। নিশ্চয়ই কোনোও চেনালোক, যিনি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন। গাড়িটা এবার ব্যাক করছে। কাছাকাছি পেঁছেই দরজা খুলে যিনি লাফিয়ে নেমে তাকে জড়িয়ে ধর'লন তাঁর কথা কল্পনাতেও আসেনি। দু' হাতের চাপে ততক্ষণে হাঁসফাঁস অবস্থা অর্জুনের। মেজর কিন্তু নিঃশব্দ নন। গাড়ি থেকে নামামাত্র সামনে চিৎকার করে যাচ্ছেন, "এই যে মিস্টার থার্ড পাণ্ডব, কী সারপ্রাইজ, আঃ, কতদিন পরে দেখলাম আমাদের গ্রেট ডিটেকটিভকে, লম্বা হয়েছে, উঁহু, একটুও মোটা হওনি, দ্যাটস ফাইন, অমলবাবুর খবর কী ?"

কোনোওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লম্বা-চওড়া দাড়িওয়ালা মানুষটির মুখে সরল হাসি দেখলো অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কেমন আছেন ?"

"খুব ভালো। যাকে বলে ফার্স্ট ক্লাস। একটু বুড়ো হয়েছি এই যা।" বলে আকাশ-ফাটানো হাসলেন। অর্জুনের মনে হলো এই মানুষটি একইরকম রয়েছেন। সেবার কালিম্পং থেকে শুরু করে আমেরিকা-ইউরোপে সে মেজরের সঙ্গে দিনের পর দিন থেকেছে। মেজরকে দেখলেই মনে হতো হার্জের আঁকা ক্যাপ্টেন হ্যাডক রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এবার দাড়িতে সাদা ছোপ লেগেছে

একটু বেশি পরিমাণে, এই যা।

ট্যাক্সিতে বসে অর্জুন বললো,"বিষ্টুসাহেবের কাছে খবর পেয়েছিলাম আপনি এদেশে এসেই কালিম্পঙে চলে গিয়েছেন। কাজ হয়েছে ?"

"কাজ ? কাজের জন্য তো আমি যাইনি। ওখানকার একজন লামা আমাকে চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁর পেটে একটা অসুখ হয়েছে। এখানকার ওষুধে কাজ দিচ্ছে না তাই আমায় ওদেশি ওষুধ এনে দিতে লিখেছিলেন। সেটাই দিয়ে এলাম।" মাথা নাড়লেন মেজর, "এখন ক'দিন রেস্ট নেব, যাকে বলে অখ, অখ—।"

"অখণ্ড বিশ্রাম।" অর্জুন সাহায্য করলো।

"ঠিক। মাঝে-মাঝে একটা বাংলা শব্দ ভীষণ বিট্রে করে। তোমাদের হাতে কোনোও কাজ নেই তো ? গুড। কী ? মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললে না কি।" চোখ বড় করলেন মেজর।

অর্জুন হাসলো, "আমরা এখন তিনটে কেসে জড়িয়ে পড়েছি।"

"তিন-তিনটে ? কোনোও গোয়েন্দা একসঙ্গে তিনটে কেস করে না। আমি তো অন্তত পড়িনি। ইভ্ন শার্লক হোমস! তিনটে ডিফারেণ্ট কেস !"

না। দুটো গায়ে-গায়ে। একটা আলাদা।"

"ইণ্টারেস্টিং। বলে ফ্যালো ব্যাপারটা।" কথাটা বলেই মেজর সোজা হয়ে সামনের সিটের দিকে তাকালেন। সেখানে ড্রাইভার আপন-মনে গাড়ি চালাচ্ছে। লোকটি নেপালি। সম্ভবত মেজর কালিম্পং থেকেই তাকে ভাড়া করেছেন। মেজর তাকে জিজ্ঞেস করলেন,"আপ ইংলিশ জানতা হ্যায় ?"

"ইয়েস স্যার।" লোকটি মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিলো।

"হিন্দি তো জানতা হ্যায়। বেঙ্গলি ? বাংলা ?"

"অল্প-অল্প।"

"ডেঞ্জারাস। তা হলে তো থার্ড পার্সনের সামনে আলোচনা করা যাবে না অর্জুনবাবু। কী করা যায় ?" মেজরকে খুব চিন্তিত

দেখলো।

অর্জুন এতক্ষণ ড্রাইভারের অস্তিত্ব খেয়াল করেনি। কিন্তু তার মনে হলো মেজর একটু বেশি চিন্তা করছেন। কালিম্পঙের একজন নেপালি ড্রাইভারের কোনোও স্বার্থ থাকতে পারে না কালাপাহাড়ের বাসে। কিন্তু মেজর যেভাবে গম্ভীর মুখে এখন বসে আছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে তিনি সত্যিই তৃতীয় ব্যক্তির সামনে মুখ খুলতে চান না। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা খুব মজাদার হয়ে দাঁড়ালো। গাড়ি চলছে জলপাইগুড়ির দিকে কিন্তু কেউ কোনোও কথা বলছে না। মেজর গম্ভীর হয়ে রাস্তা দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। এবার তাঁর নাকডাকা শুরু হয়ে গেল। সেইসঙ্গে ড্রাইভারও মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকালো। কথা বন্ধ করা মাত্র কোনোও মানুষ এমন চট করে গভীর ঘুমে ঢুকে যেতে পারে তা মেজরকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অমল সোমের বাড়ির সামনে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া হলো। সুটকেস নামিয়ে মেজর হাত-পা আকাশে ছোঁড়ার চেষ্টা করলেন, "একটু সময় নিয়ে স্নান করা যাবে, কী বলো?"

"আপনি স্নান করুন। বিষ্টুসাহেব নিশ্চয়ই এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। হাবুদা আছে। আমাকে এখনই বাইক নিয়ে ছুটতে হবে হৈমন্তী-পুরে।"

"সেটা কোথায়?"

"এখান থেকে প্রায় একশো কিলোমিটারের বেশি দূরে একটা চা-বাগান।"

"বাট হোয়াই? যাচ্ছো কেন?"

"ওই যে তখন বললাম, তিন-তিনটে কেসের কথা। এটি তার একটা।"

মেজর গেট খুলে সুটকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই হাবুকে দেখা গেল। হাবু বাগানে দাঁড়িয়ে মেজরকে দেখছিল সম্ভবত। তার মুখের ভঙ্গি সুখকর নয়। মেজরকে হাবু অপছন্দ করছে। মেজর

জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম হাব‍ু ? গ‍ুড। স‍ুটকেসটা ভেতরে রাখো। বিষ্ট‍ুসাহেব কী করছেন ? অমলবাব‍ু কোথায় ?"
পাশে দাঁড়িয়ে অজ‍্র্ন বললো, "আপনি বোধহয় ভুলে গিয়েছেন হাব‍ুদা কানে শোনে না এবং কথাও বলতে পারে না। অমলদা এখন শিলিগ‍ুড়িতে।"
"শিলিগ‍ুড়িতে কেন ?"
"ওই কেসের ব্যাপারেই ওখানে গিয়েছেন।"
"আশ্চর্য ! তখন থেকে কেস-কেস করছ অথচ ঘটনাটা বলছ না !"
"কী করে বলব ? আপনি তো ঘ‍ুমোচ্ছিলেন।"
"ঘ‍ুমোচ্ছিলাম ? আমি ? ইম্পসিব‍্ল। চোখ বন্ধ করে ভাবছিলাম। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ড্রাইভারটা ছিল,তাই আমরা আলোচনা করিনি। কিন্তু এই হাব‍ুচন্দ্রের সঙ্গে তোমরা কম‍্যানিকেট করো কী করে ?"
"আপনি সব ভুলে গেছেন। হাব‍ুদা ঠিক ব‍ুঝে নেয়। তা হলো আপনি বিশ্রাম কর‍ুন। হাব‍ুদা, ইনি বিষ্ট‍ুসাহেবের সঙ্গে থাকতেন। স্নান-খাওয়ার ব্যবস্থা করো।" কথা বলার সঙ্গে আঙ‍ুলের ইঙ্গিতে বক্তব্য ব‍ুঝিয়ে অজ‍্র্ন তার নিজের বাইকটার দিকে এগিয়ে গেল। মেজর কয়েক পা হেঁটে হাব‍ুর হাতে স‍ুটকেস ধরিয়ে দিয়ে অজ‍্র্নের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন। অজ‍্র্ন এঞ্জিনে স্টার্ট দেওয়ামাত্র বললেন, "তোমার হাত পাকা তো ? আমার আবার বাইকে উঠতে খ‍ুব নার্ভাস-নার্ভাস লাগে !"
"আপনি উঠবেন মানে ?" অজ‍্র্ন অবাক।
"অদ্ভুত প্রশ্ন তো !" মেজর খিঁচিয়ে উঠলেন, "উনি যাবেন একশো কিলোমিটার দ‍ুরে কেস করতে, আর আমি এখানে বসে সজনের ডাঁটা খাব ? তাছাড়া তিন-তিনটে কেসের গল্প এখনও শোনা হয়নি।"
মেজর বাইক নাচিয়ে পেছনের সিটে বসে বললেন, "পেছনের চাকার হাওয়া ঠিক আছে তো ?"
অজ‍্র্ন কাতর চোখে তার বাইকের চাকা দেখলো। এই লাল বাইকের

ওপর তার খুব মায়া। কাউকে হাত দিয়ে দেয় না। মেজরের ভারী শরীর বইলে বাইকটার ক্ষতি হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে। তবু শেষ চেষ্টা করলো, "আপনি স্নান করে বিশ্রাম নেবেন বলেছিলেন!"

"বিশ্রাম আমার কপালে নেই ভাই। চলো।"

অগত্যা চাকা গড়ালো। পেছনের ভার খানিকক্ষণ বাদেই সয়ে গেল অর্জুনের। মেজর এবার তাকে প্রায় আঁকড়ে ধরেছেন। অর্জুন তাঁকে সহজ হয়ে বসতে বলায় তিনি রেগে গেলেন, "নিজে মাথায় হেলমেট পরেছ, আমার মাথা খালি, ছিটকে পড়লে কী হবে ভেবে দেখেছ? হ্যাঁ, এবার বলো, হৈমন্তীপুর নাকি ছাই, সেখানে কী হচ্ছে?"

বাইকে স্পিড বাড়িয়ে তিস্তা ব্রিজের দিকে যেতে যেতে অর্জুন হাওয়ার ওপর গলা তুলে বললো, "খুন হচ্ছে।"

৮
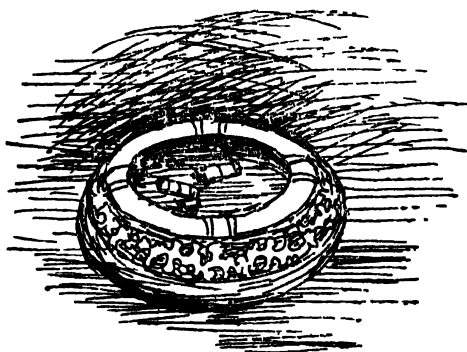
লাল বাইকটা ছুটে যাচ্ছিল ডুয়ার্সের সুন্দর চওড়া পথ ধরে। গয়েরকাটা বীরপাড়ার মোড় হয়ে যখন অর্জুনরা জলদাপাড়ার জঙ্গলের গায়ে পৌঁছল তখন সূর্যদেব পাততাড়ি গোটাতে ব্যস্ত। ব্যাক সিটে মেজর এখন অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে আছেন। সারাটা পথ আর মুখ খোলেননি। খুন হওয়ার গল্পটা শোনার পর থেকেই তিনি চুপচাপ। ভুল হলো, ঠিক চুপচাপ নন তিনি, ঠোঁট বন্ধ করে সমানে একটা সুর বের করে যাচ্ছেন নাকের ফুটো দিয়ে। কানের কাছে সেটা খুব শ্রুতিকর নয় কিন্তু অর্জুন সেটা সহ্য করেছিল। পুরনো দিনের বাংলা গান থেকে আরম্ভ করে আধুনিক ইংরেজি গান, কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

অর্জুনের অস্বস্তি শুরু হলো মাদারিহাট টুরিস্ট বাংলো ছাড়ানোর পর থেকেই। দিনে-দিনে ফিরে না এলে অস্বস্তিটা যাবে না। অথচ

সেটা যে আর সম্ভব নয় তা এখন বোঝা যাচ্ছে। এসব অঞ্চলে সন্ধের মুখেই হাতি বেরিয়ে আসে জঙ্গল ফুঁড়ে। সেটা নিয়েও সে ভাবছে না। যাদের এড়াতে মিসেস মমতা দত্ত নিজের গাড়ি ছেড়ে অন্যভাবে জলপাইগুড়িতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাদের নিয়েই এখন চিন্তা। অবশ্য এখন সে একা নেই, মেজর সঙ্গে থাকায় কিছুটা সাহস পাওয়া যাচ্ছে। অর্জুন বাইকের গতি আরও বাড়ালো।

পথে কোনোও বাধা পাওয়া যায়নি। হাসিমারার মোড়ে একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়েছিল। মোড় বলেই গতি কমাতে বাধ্য হয়েছিল অর্জুন। এবং তখনই সে ভানুদাকে দেখতে পেলো। লম্বা পেটা শরীর। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষিণী চা-বাগানের ম্যানেজার। বছরখানেক আগে অমল সোমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ভদ্রলোক। না, কোনোও প্রয়োজনে নয়। গল্প শুনে আলাপ করে গিয়েছিলেন। দারুণ মানুষ। এডমণ্ড হিলারির সঙ্গে এভারেস্টের ওপর তলায় উঠে ছবি তুলেছেন প্রচুর। সেই সময় বরফের কামড়ে পায়ের কয়েকটা আঙুল ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। এক সময় একটি ইংরেজি দৈনিকের চাকুরে ছিলেন। ডেসমণ্ড সাহেবের বইয়ে ওঁর তোলা প্রচুর ছবি আছে। সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান মানুষটি এখন চা-বাগানের ম্যানেজার। অর্জুন তাঁর গাড়ির পাশে নিজের বাইক দাঁড় করালো।

মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেয়েই ভানুদা চিৎকার করলেন, "আরে সাহেব যে! এদিকে কী ব্যাপার?" একগাল হাসলেন ভদ্রলোক।

বাইক দাঁড় করাতেই মেজরও জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি পৌঁছে গিয়েছি?"

অর্জুন মাথা নাড়লো, "এখনও কিছুটা পথ বাকি। আসুন এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ভানুদা, ইনি মেজর, আমাদের খুব কাজের মানুষ, সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছেন। আর

ইনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, টি প্ল্যান্টার, এডমন্ড হিলারির সঙ্গে এভারেস্টে গিয়েছিলেন।"

বাইকে বসেই মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কতটা ?"

"মানে ?" ভানুদা জানতে চাইলেন।

"কতটা উঠেছেন ?"

"সামান্যই। মাত্র বাইশ হাজার ফুট।"

'গুড। এবার যখন নর্থ পোলে আমার জাহাজডুবি হলো তখন ভেবেছিলাম এভারেস্টের ওপরে নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হবে না। কেমন ঠাণ্ডা ?"

"প্রচণ্ড। কিন্তু কোথায় জাহাজডুবি হয়েছিল বললেন ?"

"নর্থ পোলে। বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানকার পেঙ্গুইনদের ছবি তুলবো এমন ইচ্ছে ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন একটা আমেরিকান গোঁয়ার। চার্লি বলে ডাকতাম। হাজারবার বলেছিলাম, কুয়াশায় যখন চারপাশ ঢাকা তখন আর এগিয়ো না। শুনলো না কথা। চোরা বরফে ধাক্কা খেলাম। আইসবার্গ। ব্যস। ডুবল। লাইফ জ্যাকেট পরে ওই ঠাণ্ডায় পাক্কা আট ঘণ্টা খাবি খেয়েছি জলে। হেলিকপ্টার এসে না তুললে আপনার সঙ্গে আলাপ হতো না।"

কথা শুনতে-শুনতে ভানুদা এতখানি মুগ্ধ যে, তাঁর গলায় সেটা ফুটে উঠলো, "আরে কী আশ্চর্য, আপনাকে তো ছাড়ছি না। চলুন আমার বাগানে।"

মেজর মাথা নাড়লেন, "না, নামতে পারবো না।"

"মানে ?"

"এতক্ষণ বাইকে বসে শরীর জমে গিয়েছে। এখন নেমে দাঁড়ালে আর উঠতে পারবো না। এইভাবে এতক্ষণ বসা যে কী পরিশ্রমের ! সেটা ভুলতে গান গাইছিলাম। শরীরের সব কব্জা এখন একেবারে আটকে গিয়েছে।"

"এই বাইকে আপনাকে উঠতে হবে না। আমার গাড়িতে পা ছড়িয়ে

বসুন।”

এবার অর্জুন আপত্তি করলো, “ভানুদা, আমি একটা খুব জরুরী কাজে হৈমন্তীপুর চা-বাগানে যাচ্ছি। এখন আপনার ওখানে যাওয়া যাবে না।”

“হৈমন্তীর?” চমকে উঠলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, “সেখানে কেন?”

“মিসেস মমতা দত্তকে একটা খবর দিতে।”

‘হৈমন্তীপুরের এখনকার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা আছে তো?”

“কিছুটা আছে।”

“গতকালও মিসেস দত্তের বাবুর্চি খুন হয়েছে।”

হঠাৎ মেজর বলে উঠলেন, “অ্যানাদার খুন? তা হলে তো আমাদের সেখানে যেতে হচ্ছেই। নো মিস্টার বন্দ্যোপাধ্যায়, এর পরের বার আপনার সঙ্গে দেখা করবো।”

ভানুদা হাত নাড়লেন, “জাস্ট এ মিনিট। সন্ধে হয়ে এসেছে। আমার মনে হয় আজকের রাতটা আমার ওখানে কাটিয়ে কাল সকালে গেলেই ভালো হবে।”

অর্জুন মাথা নাড়লো, “তাহলে কথার খেলাপ হয়ে যাবে। মিসেস দত্তকে আমি কথা দিয়েছি আজই খবর দেবো। আপনি কি কিছু আশঙ্কা করছেন?”

“হ্যাঁ। বাগানে ঢোকার আগেই বিরাট নীলগিরি ফরেস্ট। একটার পর একটা খুন হচ্ছে সেখানে। তা হলে চলো, লোক্যাল থানায় তোমাদের নিয়ে যাই। ওদের এসকর্টকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।”

“কিন্তু থানায় যাওয়াটা এই মুহূর্তে ঠিক কাজ হবে না। আপনি যাদের ভয় পাচ্ছেন তাদের নজর নিশ্চয়ই থানার ওপরেও আছে।”

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, “বাইক-টাকে এখানে রেখে তোমরা আমার গাড়িতে ওঠো। তিনজনেই যাই।”

মেজর চটপট বলে উঠলেন, "দ্যাটস নট এ ব্যাড আইডিয়া।"

এই সময় একটা পুলিশের জিপকে দেখা গেল। সম্ভবত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি দেখেই দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন, "কেমন আছেন সার?"

ভানুদা হাত নাড়লেন, "ভালো। কী খবর?"

জিপে বসেই দারোগা উত্তর দিলেন, "এই চলছে। এমন একটা চাকরি মশাই যে, একটু শান্তিতে থাকার জো নেই।"

ভানুদা জিজ্ঞেস করলেন, "হৈমন্তীপুরে শুনলাম গত রাত্রেও মার্ডার হয়েছে?"

"আর বলবেন না। আজ ভোরে নাকি একটা অ্যাম্বাসাডার এসেছিল এ তল্লাটে, শিলিগুড়ি থেকে। খবরটা পেয়ে ছুটোছুটি করলাম কিন্তু কোনোও লাভ হলো না। হৈমন্তীপুরে ঢোকার মুখে যে সাঁকোটা ছিল সেটা কেউ উড়িয়ে দিয়েছে। গাড়ি যাচ্ছে না আর। মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলাকে বাগানটা বিক্রি করে দিয়ে যেতে হবে।" দারোগাবাবু বললেন।

"ওঁকে আপনারা প্রোটেকশন দিচ্ছেন না?"

"কাকে দেবো? আমাদের না জানিয়ে হুটহাট জলপাইগুড়ি চলে যাচ্ছেন। এঁরা কারা?" দারোগার চোখের দৃষ্টি ঘুরলো।

"আমার বন্ধু।" ভানুদা জানাতেই দারোগা হাত নেড়ে চলে গেলেন।

অর্জুন এবার জিজ্ঞেস করলো, "কী করবেন? আপনার গাড়ি তা হলে হৈমন্তীপুরে ঢুকবে না। সাঁকো থেকে বাংলো কতদূর?"

"মাইলখানেক তো বটেই।" মনমরা হয়ে গেলেন ভানুদা।

"তা হলে আমরা চলি। এখন সাঁকোর নীচে জল থাকার কথা নয়। বাইকটাকে পার করাতে পারবো। ফেরার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।"

অগত্যা যেন রাজি হতে বাধ্য হলেন ভানুদা, "বেশ। রাত ন'টা

পর্যন্ত তোমাদের জন্য আমি অপেক্ষা করবো। খুব চিন্তায় ফেলে দিলে ভাই।"

অর্জুন আর অপেক্ষা করলো না। মেজর বললেন, "এই নামে এক-জন অ্যাক্টর ছিলেন না? খুব হাসাতেন?"

"হ্যাঁ। সেটা প্রথম দর্শনে ওঁকে বলেছিলেন অমলদা। শুনে ভানুদা জবাব দিয়েছিলেন, কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন? উনি জিনি-য়াস, আমি ওয়ান অব দ্য ম্যান।" অর্জুনের কথা শুনে মেজর এমন হেসে উঠেছিলেন যে, বাইকটা জোর নড়ে উঠলো। মেজর বললেন, "সরি।"

একটু বাদেই হেডলাইট জ্বালাতে হলো। রাস্তা নির্জন। দু'পাশে বাড়িঘরও নেই। হাসিমারা ছাড়াবার পরেই কেমন জঙ্গুলে আব-হাওয়ায় এসে গিয়েছিল ওরা, এবার সেটা গভীর হলো। হঠাৎ মেজর অর্জুনের পিঠে টোকা মারলেন। অর্জুন ঘাড় না ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কিছু বলছেন?"

মেজর গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কানের কাছে মুখ এনে, "তোমার সঙ্গে রিভলভার আছে তো? গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নাও।"

অর্জুন স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলো, "আমার কাছে কোনোও অস্ত্র নেই।"

"যাচ্চলে।" মেজর ককিয়ে উঠলেন।

"আপনি কি ভয় পাচ্ছেন?"

"নো, নেভার। সেবার হার্লেমে মারপিট করেছিলাম খালি হাতে। ভয় আমি পাই না হে। তবে সাবধানের তো মার নেই। আর কত-দূর? আমার দুটো পা এমন অবশ হয়ে গিয়েছে যে, ও দুটো আছে কিনা তাই বুঝতে পারছি না।"

মেজরের গলার স্বর শুনে অর্জুনের মায়া হলো। ভারী শরীর নিয়ে একভাবে বসে থাকা সহজ কথা নয়। কিন্তু এই মানুষটাই কী

করে তা হলে আফ্রিকা, নর্থ পোলে অথবা তিব্বতে অভিযান করে বেড়ান? মাঝে-মাঝে মনে হয় মেজর সমানে গুল মেরে যাচ্ছেন, কিন্তু বিষ্টুসাহেব বলেছেন ওঁর সবচেয়ে বড় গুণ কখনওই মিথ্যে কথা বলেন না।

অর্জুন নজর রাখছিল। প্রত্যেক চা-বাগানের সামনে নাম লেখা বোর্ড থাকে। সেটা থেকেই হৈমন্তীপুরের হদিস পেতে হবে। হঠাৎ দারোগার কথাটা মনে এলো। সকালে তিনি একটা অ্যাম্বাসাডারের খোঁজ করেছিলেন? কোন্ অ্যাম্বাসাডার? ভদ্রলোক বিশদে বলেননি। আজ সকালে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে মিষ্টির দোকানে যেটা দাঁড়িয়ে ছিল, অমলদার অনুরোধে যে-গাড়িটা তাদের লিফ্ট দিয়েছিল সেইটে কি? শিলিগুড়িতে পৌঁছবার পর এ নিয়ে অমলদার সঙ্গে কথা বলার আর সুযোগ হয়নি। তবু ব্যাপারটা মনে বিঁধতে লাগলো। পরক্ষণেই সে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলো। হৈমন্তীপুরের কেসটা যখন সে নিচ্ছে না তখন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?

বাইকের হেডলাইটের আলো সাইনবোর্ডের ওপর পড়তেই অর্জুন গতি কমিয়ে বললো, "আমরা এসে গিয়েছি।" মেজর পেছন থেকে বললেন, "কোথায় এলাম? চারপাশ তো অন্ধকার!"

তৎক্ষণে রাস্তাটা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। পিচের রাজপথ থেকে একটু নুড়িতে ভরা পথ নেমে গিয়েছে বাঁ দিকে। চা-বাগানের রাস্তা যেমন হয়। অর্জুন বাঁ দিকে বাইক ঘোরালো। মেজর বলে উঠলেন, "ভাঙা ব্রিজটাকে খেয়াল করো। উঃ কী অন্ধকার রে বাবা। সেবার নিউ ইয়র্কে এক ঘণ্টার জন্য পাওয়ার চলে গিয়েছিল। ঠিক এমন অন্ধকার হয়েছিল সেখানে। অমন ঘটে না বলে কেউ তো বাড়িতে মোমবাতি পর্যন্ত রাখে না।"

গতি কম ছিল। মিনিট দেড়েক যাওয়ার পর সাঁকোটাকে দেখা গেল। কাঠের সাঁকো। বড়জোর হাত পনেরো হবে। ঠিক মাঝখানের কাঠ-

গুলো উধাও। গাড়ি যাওয়া-আসা অসম্ভব, কিন্তু অর্জুনের মনে হলো সার্কাসের বাইক ড্রাইভাররা ওই ফাঁকটুকু বাইক নিয়ে লাফিয়ে যেতে পারে। হেডলাইটের আলোয় সাঁকোর নিচেটা দেখলো অর্জুন, তারপর বললো, "এবার আপনাকে নামতে হবে। বাইকটাকে নীচে নামাতে হবে।"

একদম ইচ্ছে ছিল না মেজরের। গাঁইগুঁই করে তিনি কোনোও রকমে নীচে নেমে চিৎকার করে বসে পড়লেন। বোঝা যাচ্ছিলো পায়ে বিন্দুমাত্র জোর নেই। একনাগাড়ে বসে-বসে ও দুটোতে ঝিঁঝি ধরে গেছে। অর্জুন হেসে বললো, "মোটর বাইকের পেছনে বসে আপনার এই অবস্থা ! আর ভাবুন তো, কালাপাহাড়ের কথা ? ভদ্রলোক দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতেন।"

খিঁচিয়ে উঠলেন, "ইঃ, আমাকে কালাপাহাড় দেখিও না। আমি কি ওরকম লোক ? অদ্ভুত তুলনা।"

মেজরের পা ঠিক হতে যে সময় লাগলো তার মধ্যে অর্জুন দেখে নিলো সাঁকোর নিচে দিয়ে কোনোওমতে বাইকটাকে পার করা সম্ভব হবে। যা ভেবেছিল ঠিক তাই, জল নেই। কয়েকটা বড় বোল্ডার পড়ে আছে শুকনো হয়ে। মাঝে মাঝে বাইকটাকে দু'হাতে তুলতে হবে এই যা। পায়ে-পায়ে শুকনো ঝোরাটা পার হয়ে আবার রাস্তায় উঠতেই ওরা পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকাতেই অন্ধকারের মধ্যেই একটা ছায়ামূর্তিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। মেজর চিৎকার করলেন, "অ্যাই কে ? হু আর ইউ ?"

অর্জুন মোটর বাইকের হেডলাইট ঘুরিয়ে লোকটির পেছনটা দেখতে পেলো এক ঝলক। চট করে পাশের চা-বাগানের মধ্যে মিলিয়ে গেল সে।

মেজর বললেন, "লোকটা কে হে ? পালালো কেন ওভাবে ?"

"হয়তো গার্ড দিচ্ছিলো। আমরা এসেছি এই খবর দিতে গেল।"

"কাকে ?"

"সেটাই তো জানি না।"
অর্জুন আবার বাইক চালু করলো। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "উঠতে হবে?"
"না হলে যাবেন কী করে? হাঁটবেন?"
"হাঁটা আমাকে দেখিও না তৃতীয় পাণ্ডব? এক রাত্রে সাহারায় আমি কুড়ি মাইল হেঁটেছিলাম। ঠিক আছে, উঠছি।" বাইকে উঠে তিনি বললেন, "ভানুবাবুর প্রস্তাবটা খারাপ ছিল না। আজ রাত্রে ওঁর বাড়িতে রেস্ট নিয়ে কাল সকালে এলে হতো।"
"পরিশ্রমই হয়নি যখন, তখন রেস্ট নেওয়ার কী দরকার?"
মেজর নাক দিয়ে যে শব্দটা করলেন তাতে কথাটা যে খুব অপছন্দের, তা বোঝা গেল।
অন্ধকার চিরে হেডলাইটের আলো এগিয়ে যাচ্ছিলো। রাত্রে বাগানের চেহারা ভালো বোঝা যাচ্ছে না বটে কিন্তু রাস্তার ওপর যেভাবে শুকনো ডালপালা ছড়ানো আছে, তাতেই স্পষ্ট, ইদানীং যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। একটু বাদে বাগানের ফ্যাক্টরি এবং অফিসগুলো নজরে এলো। কোথাও আলো নেই। একটি মানুষকেও কাছেপিঠে দেখা যাচ্ছে না।
অর্জুন দু'বার হর্ন দিলো। তারপর এগিয়ে গেল সামনে। ডান দিকে বাঁক নিতেই আচমকা একটি আলোকিত বাংলো চোখে পড়লো। অনুমান করা গেল এটিতেই মমতা দত্ত থাকেন। বাংলোয় বিদ্যুৎ আছে। টেলিফোন মৃত কিন্তু বিদ্যুতের লাইন যদি ঠিক থাকে তা হলে আর সব জায়গা অন্ধকার কেন?
গেট বন্ধ। ভেতর থেকে তালা দেওয়া। অর্জুন হর্ন দিলো। মমতা দত্তের নিজস্ব কর্মচারীরা নিশ্চয়ই পাহারায় থাকবেন কিন্তু তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অর্জুন আরও কয়েকবার হর্ন দিলো। মেজর নেমে দাঁড়ালেন। গেটের সামনে গিয়ে চিৎকার করলেন, "বাড়িতে কেউ আছেন? আমরা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি!"

বাড়িটা ছবির মতো নিশ্চল রইলো।

অর্জুন বললো, "আপনি বাইকটার কাছে থাকুন, আমি ভেতরে ঢুকছি।"

"ভেতরে ঢুকবে কী করে? গেট তো বন্ধ।"

"গেটটা টপকাতে হবে। আলো জ্বলছে যখন, তখন মানুষ নিশ্চয়ই ভেতরে আছে।"

বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে অর্জুন এগিয়ে গেল। গেটের উচ্চতা ফুট ছয়েকের। খাঁজে পা দিয়ে সে শরীরটাকে ওপরে তুলে লাফিয়ে নামলো নীচে। দু'পাশে বাগান, মাঝখানে গাড়ি চলার পথ। সেই পথ ধরে বাংলোর দিকে এগোতেই সে দাঁড়িয়ে পড়লো। বাংলোর গাড়িবারান্দার নীচে সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে আছে একটা শরীর। রক্তের ধারা বেরিয়ে এসে জমাট বেঁধে গেছে পাশে।

৯
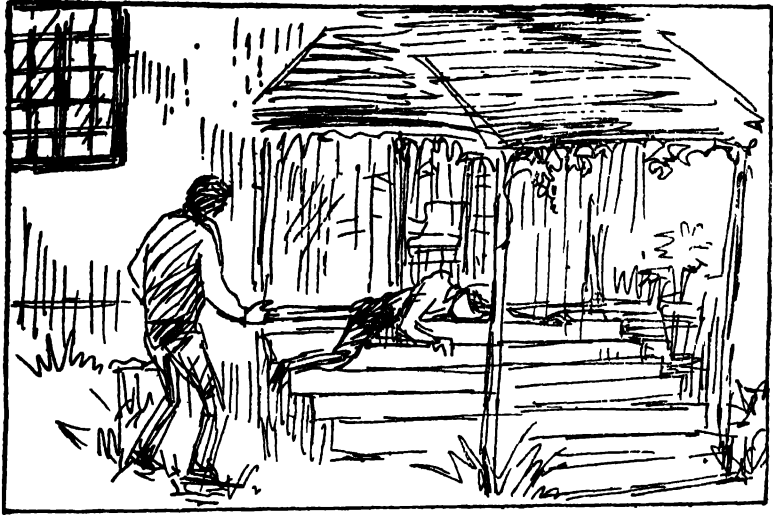
এই ভর সন্ধেতেই বাগানে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এক বুক নির্জনতা নিয়ে বাংলোটা স্থির হয়েছে গায়ে আলো মেখে, যার সিঁড়িতে পড়ে আছে একটি মানুষ। মৃত। অর্জুন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে মেজর গলা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো? তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বেল-টেল বাজিয়ে কাউকে ডাকো!"

গেট পর্যন্ত দূরত্ব অনেকখানি। মৃতদেহ পড়ে থকার খবরটা দিতে হলে সেখানে ফিরে যেতে হয়। অবশ্যই এতে নার্ভাস হবে। অর্জুন হাত তুলে ইশারায় তাঁকে থামতে বলে এগিয়ে গেল। মৃতদেহের বেশ খানিকটা দূর দিয়ে সিঁড়ির ওপর উঠে আবার ফিরে তাকালো। অন্তত ঘণ্টা চারেক আগে খুন হয়েছে লোকটা। শরীর থেকে বেরনো রক্তের ধারায় ইতিমধ্যে মাছি জাতীয় পোকামাকড় এসে

বসেছে। লোকটার পরনের পোশাক বলে দিচ্ছে মিসেস মমতা দত্তের এই বাড়ির পাহারাদার ছিল সে। এখন মৃতদেহ পরীক্ষা করার সময় নয়। যদিও রক্ত এখন চাপ বেঁধে গেছে তবুও খুনি যে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে তাব নিজেরও বিপদ। ভেতরে ঢোকার দরজাটা খোলা। সেখানেও আলো জ্বলছে।

এই ব্যাপারটা একটু আশ্চর্যজনক। এখন যে সময়, তাতে ঘণ্টা-চারেক আগে তো রীতিমত দিনের আলো থাকার কথা। সেইসময় যদি খুন হয়ে থাকে তা হলে সন্ধের পর এ-বাড়ির আলো জ্বাললো কে? মিসেস দত্ত বাড়িতে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এই খুনের কথা পুলিশকে জানাবার চেষ্টা করতেন। তা হলে কি মিসেস দত্তকেও খুন করে গিয়েছ আততায়ী? অর্জুনের কেমন শীত-শীত করছিল আচমকাই। কিন্তু মিসেস দত্ত সত্যি খুন হয়েছেন কিনা তা না জেনে ফিরে যাওয়ার কোনোও মানে হয় না। সে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ঘরটি ড্রইং রুম নয়, বোধহয় মালিকের সঙ্গে যেসব মানুষ আচমকা দেখা করতে আসতেন, তাঁদের এখানেই অপেক্ষা করতে হতো। এ-ঘরেও আলো জ্বলছে। অর্জুন গলা তুললো "বাংলোয় কেউ আছেন?"

আওয়াজটা এত জোরে ছিল যে, বাংলোয় কোনোও লোক থাকলে সাড়া না দিয়ে পারবে না। অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল কেউ কিংবা কারা তাকে আড়াল থেকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। হঠাৎ পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লে কিছু করার থাকবে না। এমন নিরস্ত্র অবস্থায় আর এখনো ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে।

কিন্তু কোথাও কোনোও শব্দ হলো না। এবার অর্জুনের মনে হলো আততায়ী মৃতদেহ সাজিয়ে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারে না। খুনি যত শক্তিশালী হোক না কেন, খুন করার পর

নিজের নিরাপত্তার কথা সে নিশ্চয়ই চিন্তা করবে। ব্যাপারটা এই-ভাবে ভাবতে পেরে অর্জুনের বেশ ভালো লাগলো। সে দ্বিতীয় ঘর-টিতে প্রবেশ করলো। এটিকে সুন্দর ছিমছাম ড্রইংরুম বলা যায়। সোফা থেকে শুরু করে অন্যান্য আসবাবে রুচির ছাপ আছে। যদিও দেওয়ালে ঝোলানো হরিণের জোড়া শিং এবং বাঘের মুণ্ডুসমেত ছাল চোখে বড্ড লাগছিল। এই ঘরটি দেখলে মনেই হবে না বাড়িতে কোনোও মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে।

পাশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো অর্জুন। চা-বাগানের মালিক এবং ম্যানেজাররা যে যথেষ্ট আরামে বাস করেন তা এইসব বাংলোয় এলে বোঝা যায়। পায়ের তলার কার্পেট পুরনো হলেও যথেষ্ট নরম। সিঁড়ির ওপরও আলো জ্বলছিল। প্রথম শোওয়ার ঘরে কেউ নেই। দ্বিতীয়টি লণ্ডভণ্ড। বিছানার চাদর থেকে টেবিল-চেয়ার কিছুই স্বস্থানে নেই। অর্থাৎ এখানে ঝামেলাটা হয়েছিল। সেটা কার সঙ্গে? লাগোয়া বাথরুমের দরজাটাও খোলা। উঁকি মেরে দেখে গেল ঘরটা ফাঁকা।

তিন-তিনটে ঘর এই বাংলোর ওপরতলায়। দেখা হলে অর্জুনের স্পষ্ট ধারণা হলো মিসেস দত্ত এ-বাংলো থেকে আগেই বেরিয়ে গিয়ে-ছিলেন, নয়তো আততায়ীরা তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত সেই সময় দরোয়ানটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, আততায়ীদের পরিচয় পাওয়ার মতো কোনোও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

অর্জুন নীচে নেমে এলো এবং তখনই টেলিফোনের কথা মাথায় এলো। ওপরেও দুটো রিসিভার দেখেছে সে। নীচে সিঁড়ির গায়ে আর একটি। রিসিভার তুলেই বুঝতে পারলো লাইন কেটে রাখা হয়েছে। এ-বাড়ির সঙ্গে বাইরের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

ঠিক তখনই বাইরে মোটর বাইকের হর্ন বেজে উঠলো। একটানা কয়েকবার। নিশ্চয়ই তার দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে মেজর বাইকের হর্ন

বাজাচ্ছেন। অর্জুন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। দরোয়ানের মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে বাগানের মাঝখানের রাস্তা ধরে এগোতেই দেখতে পেল গেটের ওপরে মেজরের পাশে আরও দুটো মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনের একজন মহিলা।

তাকে দেখতে পেয়েই মেজর চিৎকার করলেন, "কী করছিলে ভেতরে? এ-বাংলোয় ডাকাত পড়েছিল। এরা এখানে কাজ করে, ভয়ে পালিয়েছিল।"

গেটের কাছে পেঁছে অর্জুন দুটি মদেশিয়া নারী পুরুষকে দেখতে পেল। পুরুষটির বয়স হয়েছে, নারী মাঝবয়সী। দু'জনের চেহারায় ভয় স্পষ্ট। অর্জুন তাদের জিজ্ঞেস করলো, "এই গেটের চাবি কোথায় তোমরা জানো?"

মাঝবয়সী নারী বললো, "দরোয়ানকো পাশ হ্যায়।"

"তোমরা কোন্ দিক দিয়ে বেরিয়েছিল?"

"তখন এই গেট খোলা ছিল।" নিজের ভাষায় বললো বৃদ্ধ।

"বাংলোয় তখন কে কে ছিল?"

"আমরা দু'জন, মেমসাব আর দরোয়ান।" বৃদ্ধ জবাব দিলো।

"তোমরা পালালে কেন?"

এবার নারী জবাব দিলো, "ওরা আমাদের শাসাল, না পালালে খুন করে ফেলবে। চারজন লোক ছিল। বিরাট চেহারা। মুখে কাপড় বাঁধা। হাতে বন্দুক। দেখে বহুত ভয় লাগলো। মেমসাহেব ওপর থেকে বললো, আমার কিছু হবে না, তোরা পালা। তাই জান্ বাঁচাতে আমরা পালিয়েছিলাম।"

"দরোয়ান কী করছিল?"

দু'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। বৃদ্ধ বললো, "নিশ্চয়ই বাংলোয় ছিল। আমি দেখিনি।"

"এই গেটের চাবি কার কাছে পাওয়া যাবে?"

"দরোয়ানের কাছে।"

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দূরের সিঁড়ির দিকে তাকালো। এখান থেকে অবশ্য দরোয়ানের মৃত শরীর দেখা যাচ্ছে না। এইসময় মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "গেটটা খোলা যাচ্ছে না? ওরা কেউ নেই? হোয়াট ইজ দিস?"
অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কী গেট টপকে ভেতরে আসতে পারবেন!"
মেজর মুখ তুলে গেটের উচ্চতা দেখলেন, "এমন কিছু ব্যাপার নয়। সেবার উগাণ্ডায় এর চেয়ে উঁচু গাছের ডাল ধরে ঝুলে থাকতে হয়েছিল সারারাত। দেখা যাক।" এক-পা এগিয়ে থেমে গেলেন তিনি। বুড়ো আঙুলে পেছনে দাঁড় করানো বাইকটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "চোর-ডাকাতের জায়গায় ওটাকে এভাবে ফেলে যাব?"
অর্জুন বুঝলো গেট টপকাবার ঝুঁকি মেজর নিতে চাইছেন না। সে মাথা নাড়লো, "এটা ঠিক কথা। অবশ্য আপনি ভেতরে এসেই বা কী করতেন? তার চেয়ে বরং চলুন, যাওয়ার পথে থানায় খবরটা দিয়ে যাই।" মেজর হাসলেন, বোঝা গেল এই প্রস্তাবে তিনি খুশি।
অর্জুন গেটে পা দিতেই বৃদ্ধ বলে উঠলো, "মেমসাব নেহি হ্যায়?"
নারী চেঁচিয়ে উঠলো আচমকা, "ইয়ে নেহি হো সেকতা। মেমসাব অবশ্যই বাংলোয় আছেন। আমি তালা খুলছি। চল, ভেতরে গিয়ে দেখি।" কথাগুলো হিন্দি-ঘেঁষা মাতৃভাষায় বললো।
অর্জুন দেখলো নারী মাথার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে একটা কিছু বের করে আনলো। তারপর গেটের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে তালাটাকে তুলে ধরে ফুটোর মধ্যে সেটাকে ঢুকিয়ে সাবধানে ঘোরাতে লাগলো। সম্ভবত মাথার কাঁটা দিয়ে সে তালা খোলার চেষ্টা করছে। এখন ওর চোখে-মুখে যে জেদ তা কেন ডাকাত পড়ার সময় ছিল না, কেন ওরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেল তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। মিনিট তিনেকের চেষ্টায় কাজ হলো। খোলা তালাটা বৃদ্ধ সযত্নে নিয়ে গেট খুলতে নারী দৌড়ে গেল বাংলোর দিকে। অর্জুন বাধা

দেওয়ার আগেই তার চিৎকারে বাগানের গাছপালায় বসা পাখিরা ডানায় শব্দ করে উড়লো। বৃদ্ধ এবং মেজর ছুটে গিয়েছিলেন চিৎকার শুনে। অর্জুন ধীরে পা ফেলে গেট থেকে বেরিয়ে বাইকটাকে ধরলো। আর এখানে দাঁড়াবার কোনোও মানে হয় না। সে যাঁকে খবরটা দিতে এসেছিল তিনি নেই। দরোয়ান-খুনের খবরটা থানায় পেঁছে দিয়ে না হয় ভানুদার বাগানে চলে যাবে। ঘড়িতে এখন রাত গড়াচ্ছে। সে এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে হেডলাইট অন করা মাত্র মেজরের বিশাল শরীরটাকে দু'হাত তুলে ছুটে আসতে দেখলো। মেজর চিৎকার করে তার নাম ধরে ডাকছেন।

মেজর কাছে এসে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তুমি তো ডেঞ্জারাস ছেলে। একটা লোক ওখানে খুন হয়ে পড়ে আছে তা এতক্ষণ বলোনি ?"

অর্জুন বললো, "গেট বন্ধ ছিল। আপনি শুনলে আরও আপসেট হতেন। চলুন।"

"চলুন ? যাব মানে ? মিসেস দত্তকে খুঁজে বের করতে হবে না।"

"উনি এই বাংলোয় নেই।"

"না। উনি আছেন। ডাকাতরা কাউকে সঙ্গে নিয়ে যায়নি।"

"কে বললো এ-কথা ?"

"মেয়েটা বলছে। ও চা-বাগানের ভেতরে লুকিয়ে থেকে ডাকাতদের চলে যেতে দেখেছে। বুড়োটা বলছে এই বাংলোর পেছন দিক দিয়ে আর-একটা যাওয়ার পথ আছে।"

অর্জুন বাইকটাকে নিশ্চল করে আবার বাংলোর দিকে এগোলো। সে যখন জিজ্ঞেস করেছিল তখন বৃদ্ধ কিংবা নারী এসব কথা জানায়নি। তার মনে হয়েছিল খুনটুন করে চলে যাওয়ার সময় ডাকাতরা গেটের ভেতরের দিকে তালা দিয়ে গেছে যাতে কেউ চট করে না ঢুকতে পারে। পেছনের দরজার কথা তার মাথায় আসেনি।

সিঁড়িতে দরোয়ানের মৃতদেহের পাশে ওরা নেই। প্রথম ঘরটিতে বৃদ্ধ একা দাঁড়িয়ে আছে। নারী দৌড়ে ওপাশের একটা ঘর থেকে

বের হলো। সে চেঁচিয়ে জানালো নীচের তলায় মেমসাহেব নেই। নারী সিঁড়ি ভেঙে ওপরে চলে গেল।
মেজর বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "পেছনের দরজাটা কোথায়?"
বৃদ্ধ একটু নড়েচড়ে উঠলো, যেন নিজেকে সামাল দিলো। দরোয়ান খুন এবং মেমসাহেব নিখোঁজ হওয়ায় বেচারা খুব মুষড়ে পড়েছে। একতলার কিচেনের পাশ দিয়ে খানিকটা এগোতেই একটা দরজা দেখা গেল। এপাশটায় মালপত্র রাখার ঘর। খোঁজার সময় অর্জুন এদিকে না এলেও একটু আগে নারী এই জায়গাগুলো ভালো করে খুঁজে গেছে।
ওরা বাংলোর পেছনে নেমে এলো। এদিকে হয়তো একসময় তরি-তরকারির বাগান ছিল। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শুধু কিছুটা খোলা জমির পরেই যে চা-বাগান শুরু হয়ে গেছে বোঝা গেল। বৃদ্ধ বললো, "ওখানে তারের বেড়ার মধ্যে একটা ছোট গেট আছে।"
মেজর সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা ভালো টর্চ থাকলে কিছুটা খোঁজাখুঁজি করা যেত। কী বলো অর্জুন?"
এই সময় তার কথা শেষ হওয়ামাত্র দোতলা থেকে একটা আর্ত চিৎকার ছিটকে উঠলো। তারপরেই নারী তার নিজস্ব ভাষায় অনর্গল কিছু চেঁচিয়ে বলতে লাগলো। শোনামাত্র বৃদ্ধ যেভাবে ছুটে গেল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। এক পলকেই তার সব জড়তা উধাও।
দোতলায় পৌঁছে অর্জুন দেখলো নারী মিসেস দত্তের শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে একটা লম্বা টুল লাগাবার চেষ্টা করছে। ওদের দেখামাত্র সে জানালো একটু আগে সিলিং-এর ওপর থেকে একটা গোঙানি ভেসে এসেছে। সে নিশ্চিত, মেমসাব ওখানে আছেন।
মাথার ওপরে কাঠের সিলিং। আপাতদৃষ্টিতে সেখানে ওঠার কোনোও রাস্তা নেই। কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারলো যেদিকে নারী টুল

রেখেছে সেইদিকেই সিলিং-এর অংশটি ঠিকঠাক বসেনি। নারীকে সরে আসতে বলে সে টুলের ওপর উঠে সিলিংটায় চাপ দিতে সেটা সরে গেল। সিলিং এবং ছাদের মধ্যে অন্তত চারফুটের ব্যবধান। দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে ওপরে তুলতেই সে ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছেন। অর্জুন চাপা গলায় ডাকলো "মিসেস দত্ত, এখন আর কোনোও ভয় নেই, আপনি নীচে নেমে আসুন।"

ভদ্রমহিলাকে একটু কেঁপে উঠতে দেখা গেল, কিন্তু তিনি দুটো হাত মুখ থেকে সরালেন না। সিলিং-এর ভেতরে তেমনভাবে ঘরের আলো ঢুকছিল না। অর্জুন আবার ডাকলো, "মিসেস দত্ত, আমি অর্জুন। আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন। মনে পড়ছে? আসুন, ধীরে-ধীরে নীচে নামুন।"

ঠিক সইসময় বাংলোর বাইরে মোটর বাইকের আওয়াজ হলো। অর্জুন চমকে উঠে মেজবকে বললো, "জানলা দিয়ে দেখুন তো আমাদের বাইকটা কিনা।"

১০

মেজর চিৎকার করতে-করতে বাইরে ছুটে গেলেন। রেগে গেলে মেজরের মুখে অদ্ভুত কথার খই ফোটে, কিন্তু আজকের শব্দাবলী অর্জুন কখনও শোনেনি। এই অবস্থায় কারও হাসা উচিত নয় বলেই সে গম্ভীর হওয়ার ভান করলো। 'কে তুই? আমি কাতলা মাছ আর তুই বাচ্চা পুঁটি, তা কি জানিস!' মেজরের গলা তখনও ভেসে আসছিল।

এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কেউ যদি তার মোটর বাইকটা নিয়ে উধাও হয় তা হলে বিপদের শেষ থাকবে না। সে মিসেস দত্তের দিকে তাকালো। যেটুকু আলো এখানে চুঁইয়ে এসেছে তাতে ভদ্র-মহিলাকে রীতিমত অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ভয়ে নার্ভাস হয়ে একদম কুঁকড়ে গিয়েছেন উনি। শরীর কাঁপছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি।

হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে আসা হাসির ধাক্কায় বাংলোটা যেন কেঁপে

উঠলো। একটা হেঁড়ে গলার সঙ্গে আর-একটি ভদ্র হাসির শব্দ হলো। পায়ের শব্দ কাছে এলো। মেজর চিৎকার করে বললেন, "দ্যাখো-দ্যাখো কে এসেছে! মিস্টার ব্যানার্জি নিজের বাইক নিয়ে চলে এসেছেন আর আমরা ভাবছিলাম কেউ তোমারটা চুরি করে পালাচ্ছে।"

অর্জুন কোনোওমতে নেমে আসতেই ভানু ব্যানার্জির মুখোমুখি হলো সে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলো, "আপনি? এখানে আসবেন তা তখন তো বলেননি?"

"নাঃ। পরে ঠিক করলাম। তোমরা যেভাবে এলে তাতে মন সাড়া দিচ্ছিল না।"

"আপনি নিশ্চয়ই সিঁড়ির গোড়ায় মৃতদেহটাকে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। মিসেস দত্ত কোথায়?"

"আততায়ীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই মনে হয় উনি ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু এইভাবে বসে থেকে সম্ভবত খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এক্ষুনি নামানো দরকার ওঁকে।" অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র ভানুবাবু এগিয়ে গেলেন।

মিনিট চারেকের চেষ্টায় সবাই মিলে মিসেস দত্তকে নামাতে পারলো। ভদ্রমহিলা দাঁড়াতে পারছেন না। চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। ভানু ব্যানার্জি বললেন, "একটু গরম দুধ খাইয়ে দেওয়া দরকার।" তিনি বৃদ্ধ কর্মচারীটিকে মদেশিয়া ভাষায় কিছু বলতেই সে ছুটে গেল। নারী তার সঙ্গী হলো। একটু বাদেই গরম দুধ এসে গেল, সঙ্গে পানীয়। চা-বাগানের মালিক অথবা ম্যানেজারের বাংলোয় এসব সচরাচর থাকেই। ভানু ব্যানার্জির নির্দেশমতো দুধে সামান্য পানীয় মিশিয়ে নারী মিসেস দত্তকে খাইয়ে দিলো একটু একটু করে। ভদ্রমহিলা এবার চোখ বন্ধ করে নিশ্বাস ফেললেন। ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

সোফায় পা ছড়িয়ে বসে মেজর বললেন, "এখন তো সমস্যা বাড়লো। ৮

দরজায় একটা ডেডবডি আর ভেতরে হাফডেড ভদ্রমহিলা। কী করা যায়?

অর্জুন চিন্তা করছিল, এক্ষুনি পুলিশকে খবর দেওয়া দরকার। অন্তত মৃতদেহটাকে ওঁরা নিয়ে যাবেনই। আর মিসেস দত্তকে কোনোও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত অথবা কোনোও ডাক্তারকে এখানে আনতে হবে।

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "ওঁর যা অবস্থা তাতে গাড়ি ছাড়া নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই বাগানের ডাক্তার এবং ক্লার্করা তো অনেকদিন চলে গিয়েছেন। এক কাজ করি, আমি বাইক নিয়ে চলে যাচ্ছি। থানায় খবর দিয়ে আমার বাগানের ডাক্তারকে তুলে নিয়ে ফিরে আসছি। ততক্ষণ ভদ্রমহিলা শুয়ে থাকুন।"

মেজরে সম্ভবত প্রস্তাবটা পছন্দ হলো না। তিনি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "আপনি চলে যাবেন? আমার আবার ডেডবডিতে ভীষণ অ্যালার্জি আছে।"

ভানু ব্যানার্জি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যালার্জি? আপনি শব্দটা ঠিক বলছেন?"

হাত বোলানো বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলেন মেজর, "হোয়াট ডু ইউ মিন? আমি ভয় পাচ্ছি? নো, নেভার। এই তো বছর পাঁচেক আগে একেবারে নরখাদকদের দেশে গিয়েছিলাম। একটা গ্রামে ঢুকে দেখি চারদিকে মানুষের কাটা মুণ্ডু। বডিটা খেয়ে নিয়ে মুণ্ডু-গুলি সাজিয়ে রেখেছে স্মারকচিহ্ন হিসাবে। আমি ভয় পেয়েছি? নো। তবে খারাপ লেগেছে। খুব খারাপ। কেন জানেন?"

কেউ প্রশ্ন করলো না। মেজর একটু অপেক্ষা করে বললেন, 'মানুষের কাটা মুণ্ডু প্রিজার্ভ করলে সেগুলো ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায়। এই যে আমার এতবড় মাথাটা একসময় ছোবড়া ছাড়ানো নারকোলের মতো হয়ে যাবে।"

ভানু ব্যানার্জি ওঁর এই পরিচয় জানতেন না। সসঙ্কোচে বললেন,

আমি খুব দুঃখিত। আপনাকে আমি কিন্তু একটুও আঘাত করতে চাইনি।"

মেজর উঠে দাঁড়ালেন, "ওকে, ওকে! অর্জুন, চলো, আমরা তিন-জনই বেরিয়ে পড়ি। যে কারণে তুমি এসেছিলে সেটা তো এখন বাহুল্য হয়ে গেছে। তাই না?"

অর্জুন মাথা নাড়লো, "ভানুদা আপনি আর দেরি করবেন না।"

ভানু ব্যানার্জি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে মেজর আবার সশব্দে বসে পড়লেন। একটু বাদে বাইকের শব্দ হলো এবং একটু একটু করে মিলিয়েও গেল। হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, আপনি একটানা কতদিন না-খেয়ে থেকেছেন?"

মেজর হাতটা ওপরে তুলে পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে দিলেন। "গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে বেড়াতে গিয়ে পড়ে পা ভেঙেছিল। একাই ছিলাম। দু'-পাশে পাহাড়, খাদ্যের মধ্যে আমি আর শনশন হাওয়া। সঙ্গের খাবার দু'দিনেই শেষ। তার পাঁচদিন পরে একটা হেলিকপ্টার এসে আমাকে উদ্ধার করে।"

"তা হলে আজকের রাত্রে না খেলে আপনার কোনোও অসুবিধে হবে না।"

"খাব না কেন? যদি এখানে থাকিও, কোনোও অসুবিধে নেই। এদের কিচেনে খাবারের স্টক তো খারাপ নেই।"

মেজর কথা শেষ করতেই বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালো, "মেমসাহেব বোলাতা হ্যায়।"

অর্জুন তড়াক করে উঠে বেডরুমের দিকে ছুটলো। মেজর পেছনে। মিসেস মমতা দত্ত এখনও শুয়ে আছেন, তবে ইতিমধ্যে তাঁর মুখে রক্ত ফিরে এসেছে কিছুটা। অর্জুন সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দুর্বল গলাই বললেন, "সরি।"

"না, না,। ঠিক আছে। আপনি কথা বলবেন না। আমরা ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করেছি। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন," অর্জুন

বললো।

"ঘুম আসবে না। আমি আর পারছিনা। এবার আমাকে সারেণ্ডার করতেই হবে। আমার জন্য একটার পর একটা লোক খুন হয়ে যাচ্ছে…।" এক ফোঁটা জল চোখের কোল থেকে উপচে নেমে এলো গাল বেয়ে।

অর্জুন বললো, আপনি এত ভেঙে পড়বেন না। ডাক্তার আসুক, তিনি অনুমতি দিলে আমরা কথা বলবো। নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত করা যাবে।"

মিসেস মমতা দত্ত চোখ বন্ধ করতে অর্জুন ফিরে এলো। দরজায় দাঁড়িয়ে মেজর কথাবার্তা শুনছিলেন। সঙ্গী হয়ে মাথা দুলিয়ে বললেন, "খুব স্যাড ব্যাপার।"

এখন ঘড়িতে রাত ন'টা। বাড়ির সব দরজা খোলা। আততায়ীরা যদি আবার ফিরে আসে তা হলে এবার যা ইচ্ছে তাই করে যেতে পারে। কোনোও রকম প্রতিরোধের ব্যবস্থা এখানে নেই। মিসেস দত্ত কোন্ সাহসে এখানে একা আছেন তাই বুঝতে পারছিল না অর্জুন। সে উঠে সদর দরজা বন্ধ করতে গেল। অন্তত ভেতরে ঢোকাটা যেন সহজ না হয়। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে সে অস্বস্তিতে পড়লো। লোকটার মৃতদেহ সিঁড়িতে পড়ে আছে। মৃত হলেও মানুষ তো! ওকে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করতে তাই অস্বস্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা উপেক্ষা করলো অর্জুন।

ফিরে আসামাত্র মেজর বললেন, "পেছনের দরজাটা বন্ধ করা উচিত।" অর্জুন মাথা নাড়লো। তারপর কিচেনের পাশ দিয়ে পেছনে চলে এলো। দরজাটা খোলাই ছিল। স্পষ্টত এদিক দিয়েই আততায়ীরা পালিয়েছে। মিসেস মমতা দত্তের সঙ্গে কথা বললে লোকগুলোর পরিচয় জানতে অসুবিধে হবে না। এই হত্যাকাণ্ডের সুরাহা করতে পুলিশের কোনোও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। যারা চায় না মিসেস মমতা দত্ত বাগান আঁকড়ে পড়ে থাকুন, তারাই কাজটা করিয়েছে।

অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হলো এই কেসে কোনোও আকর্ষণ নেই। সে কয়েকপা হেঁটে অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়ালো। বাংলোটাকে এখন আলোর জাহাজ বলে বনে হচ্ছে। যারা টেলিফোনের লাইন কেটেছে, তারা দয়া করেই আলোটাকে রেখে দিয়েছে। চারপাশের অন্ধকারেব মধ্যে বাংলোর এই আলোটা যেন বড্ড চোখে ঠেকছে।

হঠাৎ মাথার ভেতরে দ্বিতীয় একটা চিন্তা চললে উঠলো। আততায়ী কি সত্যি বাইরের লোক? একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির কথা ভানু ব্যানার্জিকে বলেছিলেন পুলিশ অফিসার। যে অ্যাম্বাসাডারটিকে শিলিগুড়ির পথে দেখে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন অমল সোম, তার মালিকদের কি হাত আছে এইসব খুনজখমে? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? হরিপদ সেনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওই অ্যাম্বাসাডার গাড়িটির সম্পর্ক থাকতে পারে বলে একটা আলাদা ধারণা তৈরী হয়েছিল সে-সময়। অর্জুনের গায়ে কাঁটা ফুটলো। হৈমন্তীপুর এবং শিলিগুড়ির মধ্যে একই দল চলাফেরা করছে না তো! হরিপদ সেনের কালাপাহাড় রহস্য তা হলে তো অন্যদিকে বাঁক নেবে।

অমলদা বলেন, 'কখনও আগ বাড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না। ভালো সত্যসন্ধানী নিজের কল্পনাকে পেছনে রাখেন, তা না হলে পথ ভুল হতে বাধ্য।' এতকিছু ভাবার তাই কোনোও মানে হয় না। বাংলোর দিকে পা বাড়াবার আগে অর্জুনের মনে পড়লো সেই লাইনগুলো, দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল, শিবমন্দির, হৈমন্তীপুরে এসব আছে নাকি? এই বাংলোর দুই কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেই তা অবশ্য জানা যাবে। সে পেছনের দরজাটা বন্ধ করতেই দেখলো বৃদ্ধ কিচেনে ঢুকছে। সে হাত তুলে লোকটাকে দাঁড়াতে বলে কাছে এগিয়ে গেল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "মেমসাহেব কি ঘুমিয়েছেন?

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে না বললো।

অর্জুন লোকটিকে দেখলো, "তুমি কতদিন আছো এই বাগানে ?"

"আমার জন্মই এখানে। আমার ঠাকুর্দাকে দালালরা ধরে এনেছিল হাজারিবাগ থেকে।"

"সেখানে তুমি গিয়েছ ?"

"না। কেউ নেই তো, কাউকেও চিনি না। গিয়ে কী হবে।"

"এই বাগানের চারপাশে যে জঙ্গল, তা তোমার ছেলেবেলায় ছিল ?"

"এখন কী জঙ্গল দেখছেন, ছেলেবেলায় কেউ ওই জঙ্গলে ঢুকতেই সাহস পেত না।"

"এই জঙ্গলের মধ্যে কোনোও বিল আছে ?"

"বিল ?" বৃদ্ধ ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

"বিল মানে বড় পুকুর, জলাশয়···।" ঠিক প্রতিশব্দ পাচ্ছিল না অর্জুন, না পেয়ে বললো, "সাহেবরা যাকে লেক বলে।"

"লেক ? না, না, এখানে লেক থাকবে কী করে। আমি তো কোনোও-দিন দেখিনি। জঙ্গলে দুটো ঝরনা আছে, শীতকালে শুকিয়ে যায়।" বৃদ্ধ এবার বুঝতে পারলো।

হতাশ হলো অর্জুন। কালাপাহাড়ের সম্পত্তি তো বিলের পাশে থাকার কথা। সে আর কথা বললো না। বাইরের ঘরে পৌঁছে দেখলো মেজর দু'পা ছড়িয়ে সোফায় চিত হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। মুখ হাঁ করা। চট করে মনে হবে বীভৎস এক মৃতদেহ। নাক ডাকছে না। সে গলায় শব্দ করে সোফায় বসতেই মুখ বন্ধ হলো। পা গুটিয়ে নিয়ে মেজর চোখ বন্ধ করেই বললেন, "একটু ভাবছিলাম।"

অর্জুন হাসি চাপলো, "আগে আপনার এমন ভাবার সময়ে প্রচণ্ড নাক ডাকতো।"

"এখন ডাকে না। হেঁ হেঁ। নাক ডাকা বন্ধ করার একটা কায়দা বের করেছি।"

"সে কী ? আপনি তো মিরাক্যাল করেছেন। পৃথিবীতে কেউ এর ওষুধ জানে না।"

"ওষুধ আমিও জানি না। কায়দা জানি।" মেজর কাঁধ নাচালেন।
"আরে, বলুন বলুন। বিশাল আবিষ্কার এটা।"
"সরি। এটা আমার ব্যাপার।"
অর্জুন হাল ছেড়ে দিলো। যার একবার নাক ডাকে তার বাকি জীবনে নিঃশব্দে ঘুম হয় না। এই নাক ডাকা নিয়ে কতরকমের অশান্তি হয়। মেজরের বীভৎস নাক ডাকা সে এর আগেও শুনেছে। এখন তো দিব্যি নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছিলেন। সে ঠিক করলো পরে এক-সময় মেজরের মুড ভালো থাকলে কায়দাটা জেনে নেবে।
অর্জুন বললো, "পাশেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল। একটা বিলের সন্ধান পেলে ভালো হতো।
"বিল? মাই গড। বিল নিয়ে কী হবে।"
"কালাপাহাড়ের সম্পত্তি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বিলের ধারে শিবমন্দিরের কাছে লুকনো আছে। শুনলাম এখানে কোনোও বিলই নেই।"
"যত্তসব বাজে কথা।" মেজর দাড়িতে হাত বোলালেন, "লোকটা যেখানে মন্দির পেত সেখানেই হাতুড়ি চালাত। অসম থেকে ওড়িশা কোনোও মন্দির আস্ত রাখেনি। আর সেই লোক একটা শিবমন্দিরের গায়ে সম্পত্তি লুকোবে? ইম্পসিবল।"
ব্যাপারটা ভাবেনি অর্জুন। সত্যি তো! কালাপাহাড় মন্দির ধ্বংস করতেন না। তিনি কেন বেছে বেছে একটা শিবমন্দিরের পাশে ধন-সম্পদ লুকোতে যাবেন? মেজরকে ভালো লাগলো অর্জুনের। সহজ সত্যিটা সে এতক্ষণ ভুলে ছিল, যা মেজর অনায়াসে বলে দিলেন।
এই সময় বাইরে এঞ্জিনের শব্দ হলো। সেইসঙ্গে জানালার কাঁচে আলো এসে পড়লো। অর্জুন উঠে দেখলো তিন-চারটে আলো এগিয়ে এসে গেটের সামনে থামলো। মেজর পাশে এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। চাপা গলায় বললেন, "ডাকাতগুলো ফিরে এলো নাকি?"
ততক্ষণে ভানুদাকে দেখতে পেয়েছে অর্জুন। দ্রুত এগিয়ে সদর দরজা খুলতেই তিনটে বাইক আর একটা অটো রিকশা সিঁড়ির

নীচে পৌঁছে গেল। থানার দারোগা বাইকে বসেই জিজ্ঞেস করলেন, "ডেডবডিটা কোথায় ?"

অর্জুনের খেয়াল হলো। সে মুখ নামিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো মৃতদেহটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এমন কী দারোয়ানের শরীর থেকে যে রক্ত বেরিয়ে সিঁড়িতে চাপ হয়েছিল, তাও উধাও।

ভানুদা বাইক দাঁড় করিয়ে ছুটে এলেন, "ডেডবডিটাকে কি সরিয়েছ কোথাও।"

"না। আমরা জানিই না। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পরে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছিলাম। তখন তো ওখানেই পড়ে ছিল।"

অর্জুন হতভম্ব।

দারোগা নেমে এলেন, "স্ট্রেঞ্জ ! আপনারা বলতে চান মৃতদেহ হেঁটে অদৃশ্য হলো ?"

ভানুদা ঝুঁকে সিঁড়িটা দেখলেন, "ভেজা কাপড় দিয়ে কেউ জায়গাটা মুছেছে।"

অর্জুন বাগানের দিকে তাকালো। ওরা যখন সব বন্ধ করে বসে ছিল তখন আততায়ীরা নিঃশব্দে মৃতদেহ সরিয়েছে। কিন্তু একটা ভারী শরীরকে বয়ে নিয়ে যেতে অন্তত দু'জন মানুষ দরকার। তাদের পক্ষে এত অল্প সময়ে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু সে বাংলোর পেছনে দাঁড়িয়েছিল তাই ওদের পক্ষে সামনের গেট দিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

অর্জুন দারোগাকে বললো, "প্লিজ ! আমার সঙ্গে চলুন। ওরা বেশি দূরে যেতে পারেনি এখনও।

তৎক্ষণাৎ ছোট দলটা গেটের দিকে ছুটলো। মেজর দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, "আই অ্যাম হোল্ডিং ফোর্ট, বুঝলে ? একজনের তো পেছনে থাকা দরকার !"

অর্জুন জবাব দিলো না। দারোগাবাবুর হাতে শক্তিশালী টর্চ ছিল। তিনি ভানুদার সঙ্গে আরও দু'জন সেপাইকে নিয়ে এসেছেন।

শুধু অটোওয়ালা চুপচাপ অটোতে বসে রইলো। পাঁচজনের দলটা গেট পেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই টর্চের আলোয় রক্তের দাগ দেখতে পেলো। পথের পাশে পাতার ওপর টকটকে রক্ত পড়ে আছে। দারোগা উল্লসিত। বাঁ দিকে নেমে পড়লেন। আরও কিছুটা যাওয়ার পর দ্বিতীয় জায়গায় রক্ত দেখা গেল। দারোগা গম্ভীর গলায় বললেন, "ওরা এদিক দিয়েই গেছে। বি অ্যালার্ট।"

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়লো। দারোগা তার মুখে টর্চ ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

অর্জুন মাথা নাড়লো, "এটা নিশ্চয়ই মানুষের রক্ত নয়।"

"তার মানে?" দারোগা বিরক্ত হলেন।

"দারোয়ান মারা গিয়েছে অনেকক্ষণ। তার শরীর থেকে টাটকা রক্ত এখন এভাবে পড়তে পারে না। আমাদের বিভ্রান্ত করতে কেউ রক্ত-জাতীয় কিছু ছড়িয়ে দিয়েছে।" অর্জুন ঘুরে দাঁড়ালো, "ভানুদা আপনি কি ডাক্তার আনতে পারেননি?"

ভানুদা মাথা নাড়লেন, "গিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক অসুস্থ। তাই অটো নিয়ে এসেছি ওঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ডাক্তার থাকলে বলতে পারতো এটা আদৌ রক্ত কিনা।"

১১
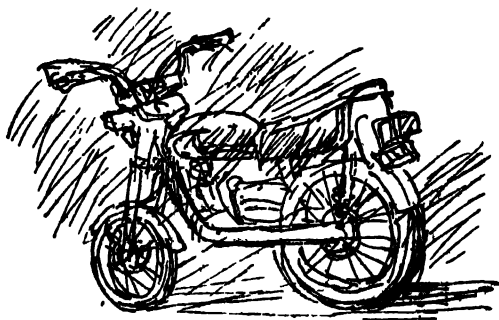
এই সময় শেয়াল ডেকে উঠলো। চা-বাগানে শেয়াল কিছু নতুন নয়, কিন্তু একসঙ্গে অনেক প্রায় কুকুরের মতো একনাগাড়ে চিৎকার করার ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

দারোগা কান খাড়া করে কিছুক্ষণ শুনে বললেন, "খুব বেশি দূরে নয়। লেটস গো।"

ভানু ব্যানার্জি একটু আপত্তি করলেন, "শেয়াল ডাকছে বলে যেতে চাইছেন কেন?"

দারোগা হাঁটতে-হাঁটতেই বললেন, "অনেক সময় শেয়ালরা কুকুরের মতো আচরণ করে। বাংলাদেশের গ্রামে অনেকে শেয়াল পুষেছে বলে শুনেছি। ডেডবডি নিয়ে ওরা যদি পালাতে চায় তা হলে শেয়ালগুলো হাঁকাহাঁকি করতেও পারে।"

কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে বাগানের মধ্যে কিছুটা যাওয়ার পরেও মৃত-

দেহের কোনোও হদিস পাওয়া গেল না। প্রথমত, রাত্রে যে-কোনোও জিনিস লুকিয়ে রাখা বেশ সহজ। দ্বিতীয়ত,, এই বিশাল চা-বাগানের মধ্যে অনুসন্ধান চালাতে গেলে প্রচুর লোকবল দরকার।

ওরা বাংলোয় ফিরে এলো। এবার ভানু ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, "মিসেস দত্ত কেমন আছেন ?"

অর্জুন মাথা নাড়লো, অনেকটা ভালো। কথা বলতে চাইছিলেন, আমি রাজি হইনি। কিন্তু ভানুদা, দ্বিতীয় কোনোও ডাক্তারকেও পেলেন না ?"

ভানু ব্যানার্জি অস্বস্তিতে পড়লেন, "আমাদের এদিকে ওই একটাই অসুবিধে। একটু বাড়াবাড়ি রকমের অসুখ হলেই ছুটতে হয় জলপাইগুড়ি, নয় শিলিগুড়ি। পুরো বাগান নির্ভর করে থাকে একজন ডাক্তারের ওপর। যাহোক, গাড়ি আছে ভাঙা ব্রিজের ও-পাশে। মিসেস দত্তকে কোনোওমতে টেম্পোতে করে বাগানের পথ-টুকু পার করে নিতে হবে। তোমার কি মনে হয়, টেম্পোতে বসতে পারবেন না ?"

ভানু ব্যানার্জি অন্যমনস্ক হয় স্কুটার ট্যাক্সিকে টেম্পো বলছেন কিন্তু অর্জুনের মনে হলো টেম্পো বলাটাই ঠিক। ওইরকম নড়বড়ে সবল বস্তুটিকে ট্যাক্সির মর্যাদা দেওয়া বাড়াবাড়ি। অর্জুন জবাব দিলো, "বোধ হয় পারবেন।"

বাংলোর দরজা ইতিমধ্যে বন্ধ। তিন-চাকার যানটিতে ড্রাইভার নেই। দরজায় ধাক্কা মারতে বৃদ্ধ এসে সেটাকে খুললো। ঘরে ঢুকে অর্জুন অবাক। একটা টুলের ওপর খাবারের প্লেট সাজিয়ে মেজর চোখ বন্ধ করে খেয়ে যাচ্ছেন। এখন বিশাল ডিমের ওমলেট পড়ে আছে প্লেটে। সে না জিজ্ঞেস করে পারলো না, "আপনি খাচ্ছেন ?"

মেজর চোখ খুললেন, "ম্যাডামকে দুঃখ দিতে পারি না। তিনি অতিথিসেবা করতে চান। তা ছাড়া শেষ কখন খেয়েছি তা তুমি জানো।" ওমলেট কাটলেন মেজর, "ডেডবডি পাওয়া গেল ?"

ভানু ব্যানার্জি মাথা নাড়লেন, "না।"

"অ্যা ? ওয়ার্থলেশ, পুলিশ ফোর্স ভাই এ-দেশের ! একটা মৃতদেহ পালিয়ে গেল, তাকেও ধরতে পারলেন না !"

দারোগা উত্তপ্ত হলেন, "আপনি একটু সংযত হয়ে কথা বলুন।"

মেজর আধচেবানো ওমলেট মুখে নিয়ে বললেন, "কেন ? হোয়াই ? হোয়াট ইজ ইওর কনট্রিবিউশন ? আপনি এখানকার ইনচার্জ। এই বাগানে পর-পর এত খুন হয়ে গেল, আপনি কী করেছেন ? একজন অসহায় মহিলা এখানে একা পড়ে আছেন তাঁর নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা করেছেন ? বলুন ! খুন হওয়ার পরেও তো আপনাদের দেখা যায় না। যায় ?"

দারোগা সোজা মেজরের প্রায় নাকের ডগায় পৌঁছে গেলেন, "হু আর ইউ ?"

মেজর একটু পেছনে হেলে বসলেন, "মানে ?"

"এই সব প্রশ্ন করার আপনি কে ? আমি কি করছি না-করছি তার জবাবদিহি আপনাকে দেবো কেন ? আমাকে অপমান করার জন্য আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি তা জানেন ? যত দোষ নন্দ দোষ ? এই বিশাল জঙ্গল আর চা-বাগানের কোন্‌খানে কে খুন হলো তা আমি থানায় বসে হাত গুনে বলতে পারবো ? খবর পেয়ে আমরা ছুটে আসি না ? না জেনেশুনে যা-তা বলে যাচ্ছেন ?"

ভানু ব্যানার্জি হাত তুললেন, "ঠিক আছে, শান্ত হোন আপনারা। এটা ঝগড়া করার সময় নয়। মিসেস দত্তকে নিয়ে যেতে হবে।"

মেজর মাথা নড়েলেন। তারপর দারোগাকে বললেন, "আপনি একটু সরে দাঁড়ান তো ! লেট মি ফিনিশ মাই ডিনার। গুড।" মুখে ওমলেট তুললেন, তিনি, "কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে, একজন পুলিশ অফিসার ডেডবডি খুঁজে পাবে না।"

দারোগা খিঁচিয়ে উঠলেন, "আমাকে কী ভেবেছেন ? ট্রেইন্ড ডগ ? গন্ধ শুঁকে ডেডবডির কাছে পৌঁছে যাবো ? মিস্টার ব্যানার্জি, এই

লোকটাকে আপনি একটু বলে দিন আমার সঙ্গে যেন উলটোপালটা কথা না বলে।"

ভানু ব্যানার্জি বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিসেস দত্ত কি ঘুমোচ্ছেন?"

"নেহি।"

"তা হলে বলো, একটু দেখা করবে।"

বৃদ্ধ ওপরে চলে গেল। মেজর খাওয়া শেষ করলেন। পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললেন, "জানো মধ্যম পাণ্ডব, সিক্সটি সেভেনে মেক্সিকোর জঙ্গলে একটা ঘোড়াকে সাবাড় করে দিয়েছিল মাংসখেকো পিঁপড়ের দল। সন্ধেবেলায় যে-ঘোড়াটাকে আমরা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম, সকালে উঠে দেখি দড়িতে তার কঙ্কালটা বাঁধা রয়েছে। তুমি ভাবতে পারো ব্যাপারটা?"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "হ্যাঁ। এরকম একটা ঘটনার কথা যেন আমি কোথায় পড়েছি।"

মেজরের দিকে তাকিয়ে দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি মেক্সিকোর জঙ্গলে—মানে?"

অর্জুন জানালো, "উনি পৃথিবীর সব দেশেই অভিযান করেছেন। একবার উত্তর মেরুতে জাহাজডুবি থেকে বেঁচে গিয়েছেন।"

দারোগা হতভম্ব। স্পষ্টতই তাঁর চোখে মুখে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছিল।

মেজর সেদিকে লক্ষ্যই করলেন না। বললেন, "ধরো, কাল সকালে দারোয়ানের ডেডবডি পাওয়া গেল। তবে শুধু কঙ্কালটি আছে। এমন তো ঘটতেই পারে।"

সঙ্গে-সঙ্গে দারোগা সোজা হলেন, "না। পারে না। এখানে ওই-সব মাংসখেকো পিঁপড়ে থাকে না। ম্যানইটারও নেই।"

"তা হলে নেকড়ে নেই, হায়েনা নেই চিতা নেই। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

মেজর কথা শেষ করতেই বৃদ্ধ ফিরে এলো। না এলে আবার গোলমাল

পাকতো। বৃদ্ধ এসে জানালো মেমসাহেব অপেক্ষা করছেন।
মেজর উঠলেন না। বাকিরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এলো। দরজায় নারী দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখে সে মিসেস মমতা দত্তের মাথার পাশে সরে গেল।
মিসেস দত্ত বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখের স্বাভাবিক চেহারা এখনও ফিরে আসেনি। মহিলাকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং নীরক্ত মনে হচ্ছিল। দারোগা বললেন, "নমস্কার মিসেস দত্ত। খানিক আগে আমি খবরটা পেলাম।"
মিসেস দত্ত মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট ঈষৎ কাঁপলো। কিন্তু কথা বললেন না।
ভানু ব্যানার্জি এগিয়ে গেলেন সামান্য, "মিসেস দত্ত, পুরো ব্যাপার-টার জন্য আমরা খুব দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে এখনই কোনোও ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। একটা ব্যবস্থাও হয়েছে। আপনি কি ধীরে-ধীরে নীচে নামতে পারবেন?"
এবার খুব দুর্বল গলায় মিসেস দত্ত বললেন, "আমি কোথাও যাব না!"
ভানু ব্যানার্জি বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "আমি আপনার সেণ্টি-মেণ্টের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, এইসময় আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন।"
মিসেস দত্ত হাত নেড়ে না বলে নিশ্বাস ফেললেন।
অর্জুন চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ। এবার বললো, "আপনি কি কথা বলার মতো অবস্থায় আছেন?"
মিসেস দত্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, "আপনি—আপনারা কি আমার কেস নেবেন?"
অর্জুন ফাঁপরে পড়লো। জলপাইগুড়ি থেকে সে অমলদার নির্দেশে এসেছিল মিসেস দত্তকে জানিয়ে দিতে যে, কেস নিতে পারছে না। কিন্তু এখানে এসে পরিস্থিতি যেভাবে বাঁক নিয়েছে তাতে না বলতে

বিবেকে লাগলো। সে বললো, "হ্যাঁ। আপনি যা চাইছেন তা হবে।"

ভদ্রমহিলাকে এবার একটু শান্ত বলে মনে হলো। তিনি বললেন, "আমার দরোয়ানের মৃতদেহ কি খুঁজে পাওয়া গেল?"

দারোগা বললেন, "না ম্যাডাম। এই রাত্রে চা-বাগানের মধ্যে বেশি খোঁজাখুজি সম্ভব হলো না। আমি কাল সকালে আরও লোক নিয়ে এসে ভালভাবে সার্চ করবো।"

মিসেস দত্ত চোখ বন্ধ করে বড় নিশ্বাস ফেললেন, "আপনারা কিছুই পারবেন না। আমাকে এইভাবে পড়ে-পড়ে মার খেতে হবে।"

কথাটা এমন স্বরে বললেন যে, ঘরে, বিষাদের ছায়া ছড়ালো। অর্জুন বুঝলো এর পরে কথা এগোলে মিসেস দত্ত মেজরের কথাগুলোই বলে ফেলবেন। সেক্ষেত্রে দারোগা ব্যাপারটাকে খুবই অপছন্দ করবেন। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই দারোগা একটা চেয়ার টেনে বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন, "আপনি যখন বলছেন কথা বলতে পারবেন, তখন কর্তব্যের প্রয়োজনেই কয়েকটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন আজ এখানে একটা খুন হয়েছে এবং আততায়ীরা কাছে-পিঠেই আছে। এই ঘটনার অন্যতম সাক্ষী আপনি। আশা করি আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন।"

"হুঁ।"

"ব্যাপারটা কখন ঘটেছিল?"

"দুপুরে। দুটো নাগাদ।"

"কতজন লোক ছিল?"

"ছ-সাতজন।"

"আপনার বাংলোর দরজা বন্ধ ছিল না?"

"ছিল। কিন্তু ওরা ডাকাডাকি করতে আমি দরোয়ানকে পাঠিয়েছিলাম ব্যাপারটা কী জানার জন্য। ওরা ভদ্রভাবে ঢুকেছিল। কিন্তু সিঁড়ির মুখেই দরোয়ানের সঙ্গে মারপিট শুরু করে দেয়। আমরা

কোনোও মতে সদর দরজা বন্ধ করে দিই। আমি বুঝতে পারি ওরা আমার সন্ধানে এসেছে। তাই এদের বলি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে। এরা আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। অনেকদিন আছে। প্রথমে আমাকে একা রেখে যেতে চায়নি। আমি বাধ্য করি। তাবপর ওপরে উঠে যাই।" মিসেস দত্ত হাঁপাতে লাগলেন।

দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা বাংলোয় ঢুকলো কীভাবে ?

"পেছনের দরজা দিয়ে। এরা যেদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করার কথা সে-সময় আমার খেয়াল হয়নি।"

"বাংলোয় ঢুকে ওরা আপনাকে খুঁজে পায়নি। কেন ?"

"সিলিঙের ওপর একটা চোরাকুঠুরি আছে। নীচে থেকে চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু ওখানে সোজা হয়ে বসে থাকা খুব শক্ত। আমি কোনোওমতে ওখানে উঠে গিয়েছিলাম। ওরা আমাকে খুঁজতে বাংলো তোলপাড় করে শেষ পর্যন্ত ভাবলো আমিও পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছি।"

"এই লোকগুলোর কাউকে চেনেন ?"

মিসেস দত্ত একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, "কারও নাম জানি না।"

"মুখ দেখলে আবার চিনতে পারবেন ?"

"হ্যাঁ পারবো। কিছুদিন হলো ওরা এই বাগানে ঘোরাফেরা করছে। যাতায়াতের পথে এদের দু-একজনকে আমি দেখেছি।"

"ওরা কখন চলে গেল ?"

"ঘণ্টাখানেকের পর আর গলা শুনিনি।"

"আপনি নেমে এলেন না কেন ?"

"মৃত্যুভয়ে। ওই এক ঘণ্টায় আমার নার্ভ চলে গিয়েছিল। ওখানে বসে থাকা যায় না। শুতে পারছিলাম না ইঁদুরের জ্বালায়। সামান্য শব্দ হলে আমি ধরা পড়ে যেতাম। ওইভাবে মাথা গুঁজে

বসে থাকতে-থাকতে আমার শক্তি চলে গিয়েছিল। আমার ভয় করছিল ওরা হয়তো কাছেপিঠে আমার জন্য ওৎ পেতে আছে।"

"হুঁ। এই লোকগুলোর কাউকে চেনা যায় এমন কোনোও চিহ্ন বলতে পারেন?"

"আমি ওদের দেখেছি জানলা দিয়ে। দূর থেকে। বাংলোয় ওরা যখন ঢুকেছিল তখন আমি চোরাকুঠুরিতে। সেখান থেকে ওদের দেখতে চাইলে আমার ডেডবডিও আপনারা খুঁজে পেতেন না। ওঃ ভগবান!" ভদ্রমহিলা আবার চোখ বন্ধ করলেন।

দারোগা এবার উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি আপনার কর্মচারী দু'জনকে জিজ্ঞেস করব। তুমি নীচে এসো।" নারীর উদ্দেশে শেষ কথাগুলো বলে দারোগা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। নারী এবং ভানু ব্যানার্জি দারোগাকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু অর্জুন দাঁড়িয়ে রইলো। তার কেবলই মনে হচ্ছিল দারোগা ঠিকঠাক প্রশ্ন করলেন না। আর ভদ্রমহিলাও প্রশ্নের জবাবে কোনোও বাড়তি কথা বললেন না। সে নির্জন ঘরের সুবিধে নেওয়ার জন্য দারোগার চেয়ারটিতে গিয়ে বসলো।

ভদ্রমহিলা তাকালেন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি নিশ্চিত যে, ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন নেই?"

"আমার শরীর বেশ খারাপ। কিন্তু আমি কোথাও যাব না।"

অর্জুন একটু চুপ করে থেকে বললো, "আপনি এতক্ষণ যা বললেন শুনেছি। কিন্তু এমন কথা কি কিছু আছে যা আপনি ওঁকে বলেননি?"

"কী কথা?"

"আমি জানি না। এমনিই জিজ্ঞেস করছি।"

"আমার মনে পড়ছে না।"

"মনে করে দেখুন। তা হলে আমাদের তদন্তে সুবিধে হবে।"

"ওরা এতদিন তোমাকে ভয় দেখিয়েছে। বাগানের লোককে খুন করেছে। ওরা ভেবেছিল ভয় পেয়ে আমি বাগান বিক্রি করে দেবো। কিন্তু তাতেও যখন কাজ হলো না তখন ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এবার সরাসরি খুন করতে চায় আমাকেই। আজ দারোয়ানকে খুন করলো, কাল আমাকে করবে।"

"এই ওরা কারা ?

"জানি না। টেলিফোন চালু ছিল যখন, তখন প্রথম অনুরোধ, পরে হুমকি দিতো।"

"লোকগুলোর কি মুখ বাঁধা ছিল ?"

"না। নর্মাল পোশাক। কিন্তু ওদের কয়েকজন বাংলায় কথা বলছিল না।"

"কী ভাষায় বলছিল ?"

"মনে হলো ওড়িয়া ভাষায়।"

অর্জুন অবাক। উত্তরবঙ্গের এইসব এলাকায় ওড়িয়া ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা খুবই কম। ব্যাপারটা অদ্ভুত। সে জিজ্ঞেস করলো, "দারোগাবাবুকে আপনি একটা কথা বলেননি। অবশ্য উনিও জিজ্ঞেস করেননি। ওরা যখন বাংলোয় ঢুকেছিল তখন আপনি চোরা কুঠুরিতে। কিন্তু বাংলোয় ঢোকার পর ওরা যেসব কথা বলেছিল তা তো আপনার শোনার কথা। কী বলছিল ওরা ?"

ভদ্রমহিলা মনে করার চেষ্টা করে বললেন, "প্রথমে খুব রাগারাগি করছিল। জিনিসপত্র ভাঙচুর করছিল হয়তো। আমি শব্দ পাচ্ছিলাম। যারা ওড়িয়া ভাষায় কথা বলছিল তাদের সব কথার মানে আমি অবশ্য বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমাকে না পাওয়ার পর ওরা হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা করছিল। একজনের কথা কানে এলো—যে করেই হোক মালিকানকে খুঁজে বের করতেই হবে। ও বেঁচে থাকলে সব

কাজ শুরু করতে পারছে না।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, “কী কাজ?”

“জানি না। ওরা নাকি চা-বাগানের গায়ে ভাঙা মন্দির দেখতে পেয়েছে। ওইরকম বলছিল।”

মহিলার কথা শেষ হতেই অর্জুন যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে লাফিয়ে উঠলো।

১২

এখন মধ্যরাত। অন্ধকারে ডুবে থাকা অকেজো এই চা-বাগানের শেডট্রিগুলো থেকে মাঝে-মাঝেই অদ্ভুত ডাক ভেসে আসছে। কৃষ্ণপক্ষের এমন রাতেও সব শান্ত হয়ে গেলে আকাশ থেকে একরকম মায়াবী আলো চুপিসারে নেমে আসে পৃথিবীতে। ঘন চায়ের লিকারে আধ চামচ দুধের মতো মিলে যায় সবার অজান্তে। দোতলার জানলায় বসে অর্জুন এইরকম দৃশ্যাবলী দেখে যাচ্ছিল। এই ঘরের একমাত্র খাটে পা ছড়িয়ে শুয়ে মেজর সশব্দে ঘুমোচ্ছিলেন। আজ রাত্রে তাঁর এখানে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। প্রতিবাদে কাজ না হওয়ায় বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বসেছিলেন, খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাববেন, একবার ডাকলেই উঠে পড়তে দেরি করবেন না। অর্জুনের মনে হলো বাইরের পৃথিবীর সব শান্তি একা মেজরই ধ্বংস করতে পারেন। একসময় অর্জুন আর পারলো

না জানলা ছেড়ে এসে মেজরকে জাগাতে হলো। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেজর বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। অর্জুন বললো, "আপনার নাক থেকে এমন শব্দ বেরোচ্ছে যে, পাশে বসে থাকা যাচ্ছে না।"

"তোমাকে বসে থাকতে কে বলেছে?" রাগী গলা মেজরের।

অর্জুন কাঁধ ঝাঁকালো, "আপনি বলেছিলেন নাক না ডাকার কি একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা কাজে লাগাতে পারলে ঘুমোন, নইলে প্লীজ, জেগে থাকুন। এরকম গর্জন শুনলে সিকি মাইলের মধ্যে কোনোও লোক আসবে না।"

ঘরের কোণে একটা ছোট্ট ডিমবাতি জ্বলছিল। মেজর খাট থেকে নেমে সংলগ্ন টয়লেটে ঢুকলেন। জলের শব্দ হলো। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, "দ্যাখো অর্জুন, যে ব্যাপারে মানুষের কোনোও হাত নেই সেই ব্যাপারে তাকে দায়ী করা উচিত নয়। একজন চোখে দেখতে পান না, একজন হাঁটতে পারেন না ভালো করে। এমন মানুষকে ভালো বাংলায় কী বলা হয়ে থাকে?"

"প্রতিবন্ধী।"

"গুড। আমিও তাই। যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমার শরীর থেকে যে শব্দ বের হয় তার জন্য এই আমি কি দায়ী?"

"তা হলে নাক ডাকা বন্ধ করার কোনোও কৌশল আপনি জানেন না?"

'জানি। কিন্তু এক কৌশলে দু'দিন কাজ দেয় না।"

অর্জুন হেসে ফেললো। তারপর জানলায় ফিরে গেল। মেজর বললেন, "আমি তোমার মতলব কিছুই বুঝতে পারছি না। মিসেস দত্তকে নিয়ে ওরা সবই চলে গেল আর তুমি কেন জিদ ধরলে আজ-কের রাতটা এখানে থেকে যেতে?"

অর্জুন চাপা গলায় বললো, "অসুবিধা কী? আপনার খাওয়া হয়ে গেছে, বাংলোর ভেতরটাও বেশ আরামদায়ক।"

"আর আমাদের সঙ্গে তো কোনোও অস্ত্র নেই !"

"একজন মহিলাকে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল তারা দু'জন পুরুষকে ভয় পাবেই।"

"ওই আনন্দে থাকো। যে দারোয়ানটাকে ওরা খুন করেছে সে যেন পুরুষ ছিল না। তা ছাড়া তুমি যখন এই কেস নিচ্ছ তা তখন খামোকা থেকে যাওয়ার কী দরকার ছিল। মিস্টার ভানু ব্যানার্জির সঙ্গে চলে গেলেই হতো। এতো অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিসেস দত্তও শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন।" মেজর আরও কথা বলতেন কিন্তু তিনি অর্জুনকে নিঃশব্দে হাত তুলে ইশারা করতে দেখলেন। তাঁর রোমাঞ্চ হলো। চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ আসছে নাকি ?"

অর্জুন হাত নামিয়ে নিলো, জবাব দিলো না। মেজর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে অর্জুনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডিমবাতির আলোয় চোখ অভ্যস্ত থাকায় প্রথমে কিছুই ঠাওর করতে পারলেন না। বাইরেটা ঘন অন্ধকার মনে হলো তাঁরা হতাশ হয়ে আবার ফিরে গেলেন ঘরের মাঝখানে। বিড়বিড় করে বললেন, "নিজেকে কেমন বন্দি-বন্দি মনে হচ্ছে।"

আকাশি আলোয় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া চোখে অর্জুন ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পেলো। গেটের ওপাশে ঝুঁকে পড়ে কিছু করছে। তারপরেই নজরে এলো, একজন নয়, আরও সঙ্গী আছে। এরা সবাই খুব নিষ্ঠার সঙ্গে ওখানে কিছু করছে। মাঝে-মাঝে পাশের জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে লোকগুলো। জঙ্গলে ঢুকতেই সরু আলো জ্বলতে দেখলো অর্জুন। ওরা টর্চ জ্বেলে কিছু খুঁজছে।

অর্জুন নিঃশব্দে জানালা ছেড়ে চলে এলো। মেজর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর সামনে এসে নিচু গলায় বললো, "আপনি ফোর্ট সামলান। আমি একটু ঘুরে আসছি। যদি কাল সকালের মধ্যে না ফিরি তা হলে অমলদাকে খবর দেবেন।"

"তোমাকে একা ছাড়বো ভেবেছো ? আমি কি এমনি এমনি রয়েছে

গেছি ?"

"না। আপনার যাওয়া চলবে না। দু'জনের কিছু হলে সারা পৃথিবী জানতে পারবে না!"

"মাইগড। তা হলে তোমার যাওয়ার দরকার কী? এই কেস তো তুমি নিচ্ছ না।"

অর্জুন কোনোও উত্তর না দিয়ে নীচে নেমে এলো। মিসেস দত্তের কাজের মানুষ দু'জন বাংলোর একতলাতেই শুয়ে আছে। বেরোতে হলে দরজা বন্ধ করার জন্য ওদের ডাকা দরকার। কিন্তু শব্দ কবার ঝুঁকি নিলো না অর্জুন। পেছনের দরজা খুলে সে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এলো। দরজাটাকে যতটা সম্ভব চেপে বন্ধ করার চেষ্টা করলো।

আকাশ নীল। প্রচুর তারা সেখানে। তাদের শরীর থেকে আলো চুঁইয়ে আসছে। অর্জুন পেছনের বাউণ্ডারি ডিঙিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। হঠাৎই একটা হতচ্ছাড়া প্যাঁচা চিৎকার করে মাথার ওপরের ডাল থেকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। মিনিট খানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে জঙ্গল ছেড়ে চা-বাগানেব গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো অর্জুন। গুঁড়ি মেরে সে অনেকটা ঘুরে বাংলোর গেটের দিকটায় চলে এলো। কান পাতলো। কোনোও কথা শোনা যাচ্ছে না। সে আর একটু এগোতেই গাছের ডালে আঘাত পেলো। সামান্য শব্দ হলো, কিন্তু সেই সময় কাছে পিঠে একটা শেয়াল গলা ছেড়ে ডেকে উঠতেই শব্দটা চাপা পড়ে গেল। অর্জুন নিজের কাঁধে হাত বোলালো। আর তখনই পাতা মাড়াবার আওয়াজ কানে এলো। কেউ খুব কাছাকাছি হাঁটছে। সে চা-গাছের মধ্যে হাঁটু মুড়ে বসে রইলো। গাছের তলার ফাঁক দিয়ে হাত পাঁচেক দূরে সরু টর্চের আলো পড়তে দেখলো সে। আলোটা ইতস্তত ঘুরে যেখানে স্থির হলো সেখানে একটা ছোট্ট পাতাওয়ালা আগাছা লাল হয়ে আছে। তারপরেই একটা হাত সেই আগাছাটাকে মাটিসুদ্ধ উপড়ে নিলো। আলো নিভে গেল এবং আওয়াজ ফিরে

গেল যেদিক থেকে এসেছিল।

ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। ওরা ফিরে এসেছে রক্তের নাম করে যা ছড়িয়েছিল তার চিহ্ন মুছে ফেলতে। অর্থাৎ অত্যন্ত সাবধানী মানুষের বুদ্ধি ওদের নিয়ন্ত্রিত করছে। চা-বাগানের গলিতে হাঁটলেই পাতা মাড়াবার শব্দ হবেই। অর্জুন প্রায় বুকে হেঁটে বাগানের ভেতর দিয়ে এগোতো লাগলো। হাত-কুড়ি যাওয়ার পর সে লোক-গুলোকে দেখতে পেলো। মোট চারজন। একজনের হাতে একটা ব্যাগ। নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কিছু বললো। তারপরই একজন একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাংলোর দিকে ছুঁড়ে মারলো। পাথরটা দোতলার জানলার কাঁচে লাগতেই সেটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়লো এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে মেজরের আকাশ ফাটানো চিৎকার ভেসে এলো, "কে? কে ছোঁড়ে ঢিল? ঢিল ছুঁড়লে পাটকেল খেতে হয় তা জানিস? মেরে একেবারে হুতুম প্যাচা করে দেবে শয়তানের নাতিদের। বদমাশ, মস্তানি হচ্ছে আমার সঙ্গে? সাহস থাকে তো সামনাসামনি এসে লড়।"

চ্যাঁচামেচি চলছিল বটে কিন্তু স্বরের ভেতর যে ভয়ার্ত ভাব, তা অর্জুনের কান এড়িয়ে যাচ্ছিলো না। লোকগুলো চাপা গলায় হেসে উঠলো। একজন হিন্দিতে বললো, "ওরা আজ বাংলো ছেড়ে বের হবে না। চল।"

হেলতে-দুলতে ওরা হাঁটা শুরু করলো। এখন আর জঙ্গুলে পথে নয়, চওড়া যে রাস্তা হাইওয়ে থেকে ভাঙা সাঁকো পেরিয়ে বাংলোয় পেঁছেছে সেটি ধরে ওরা হাঁটতে লাগলো। এই রাস্তা ধরে ওদের অনুসরণ করা বিপজ্জনক। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত থাকলে পেছন ফিরলেই ওরা তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু পাশের চা-বাগান এতো ঘন যে, ওদের সঙ্গে তাল রাখা যাবে না সেখান দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করলে। বাধ্য হয়ে অর্জুন ঝুঁকি নিলো। ওদের বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে দিয়ে ও নিঃশব্দে অনুসরণ শুরু করলো। যেহেতু

নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ায় লোকগুলো নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে হাঁটছিল তাই ওদের ঠাওর পেতে অসুবিধে হচ্ছিলো না অর্জুনের।

এক সময় ওরা রাস্তা ছেড়ে চা-বাগানের মধ্যে নামলো। সুবিধে হলো অর্জুনের। সে সঙ্গে-সঙ্গে ওদের সমান্তরাল আর-একটি গলিতে নেমে পড়লো। এদিকে চা-গাছ অব্যবহারে বেশ লম্বা হয়ে গিয়েছে। ফলে চমৎকার একটা আড়াল পেয়ে যাচ্ছে সে। ওরা এই পথে কোথায় যাচ্ছে? অর্জুন খুব কৌতূহলী হয়ে পড়ছিল।

মিনিট দশেক সতর্ক হাঁটার পরে ওরা একটা হাঁটু-জলের নদীর ধারে পেঁছে গেল। পাহাড়ী নদী। জলে স্রোত আছে। অর্জুন দেখলো ওদের একজন ব্যাগ উপুড় করে সংগৃহীত পাতা-ঘাস জলের স্রোতে ফেলে দিলো। রক্তের সব চিহ্ন জল গ্রাস করে নিলো তৎক্ষণাৎ।

চা-বাগানের শেষ এখানেই, এই নদীর পারে। ওপারে জঙ্গলের শুরু। লোকগুলোকে নদীর পাড় ধবে এবার নীচে এগোতে দেখা গেল। এবার ওদের অনুসরণ করতে হলে নদীর গায়ে ফাঁকা জায়গায় আসতেই হবে। ভোর হতে এখনও বেশ দেরি, অন্ধকারের আড়ালে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে লাগলো অর্জুন। ব্যবধান যা, তাতে ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে না থাকলে তাকে দেখতে পাবে না। অসতর্ক মানুষ তার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া অনেক দৃশ্য দেখতে পায় না। এক্ষেত্রে ওরা তো কাজ সফলের আনন্দে বিভোর।

এবার নদী একটু সঙ্কীর্ণ এবং তার ওপরে বাঁশের সাঁকো দেখা গেল। সেই সাঁকো বেয়ে লোকগুলো ওপরের জঙ্গলে ঢুকে গেল। এখানে জল বেশি নয়। যদি সাঁকোর ওপরে কেউ এদের অপেক্ষায় থাকে তা হলে সহজেই সাঁকোয় উঠলে তাকে দেখতে পাবে। এমনও হতে পারে লোকগুলো অনুমান করেছে কেউ পেছনে আছে তাই সাঁকোয় ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে। সে ঝুঁকি না নিয়ে জলে

নামলো। গুটিয়ে নেওয়া প্যান্টের প্রান্ত হাঁটু পর্যন্ত থাকলেও জল মাঝে-মাঝেই স্পর্শ করতে লাগলো। জুতো ভিজছে কিন্তু কিছু করার নেই। নদীটা পেরিয়ে সে জঙ্গলে এসে দাঁড়ালো। লোকগুলো ঢুকেছে হাত কুড়ি তফাত দিয়ে। তাদের কোনোও অস্তিত্ব এখন নেই। এদিকের জঙ্গল বেশ গভীর এবং হাঁটার পক্ষে নিতান্তই খারাপ।

মিনিট দশেক অন্ধকারে হাতড়ে শেষ পর্যন্ত একটা পায়ে-চলা পথ পেলো অর্জুন। সে অনুমান করলো এই পথেই লোকগুলো এগিয়েছে। এই জঙ্গল অবশ্যই নীলগিরি ফরেস্টের একটা অংশ। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের কথা প্রায়ই শোনা যায় এই জঙ্গলে। একেবারে খালি হাতে এগোনো ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে মানুষ এখানে নিয়মিত যাওয়া-আসা করে। হিংস্র মানুষের চেয়ে কোনোও জন্তু হিংস্রতর হতে পারে না।

হঠাৎ চোখে আলো এলো। অর্জুন পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকলো। মিনিট তিনেক চলার পর একটা খোলা চত্বর নজরে এলো। জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু, তাঁবুর বাইরে কারবাইডের গ্যাসের আলো জ্বলছে গোটা চারেক। পাতার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করলো পাশাপাশি আরও গোটা তিনেক ছোট তাঁবু আছে।

মূল তাঁবু থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এলো। যে লোকগুলোকে সে অনুসরণ করে এখানে পেঁাছেছে তাদের দেখতে পাওয়া গেল। খুব বিনীত ভঙ্গিতে কথা শুনছে। তাঁবু থেকে বের হওয়া নতুন দু'জন মানুষ ওদের পিঠ চাপড়ালো। এবার কাজ সেরে আসা লোকগুলো ছোট তাঁবুর দিকে চলে গেল। অর্জুন দেখলো দু'জন কর্তাব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কথা বলে আবার তাঁবুর ভেতর ফিরে গেল। এবার সব শান্ত। শুধু গ্যাসের আলো দপদপ করে জ্বলছে। কোথাও কোনোও পাহারাদার আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। না থাকাটাই অস্বাভাবিক। যারা এতো পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে তারা

নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাববে না এমন হতেই পারে না। আর এগিয়ে যাওয়া বোকামি হবে, অর্জুন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো। মচমচ শব্দ হচ্ছে শুকনো পাতায় পা পড়ায়, মাঝে মাঝেই সে থেমে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে এলো। জন্তু-জানোয়ার তাড়ানোর জন্য মানুষ ওই গলায় আওয়াজ করে। যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে খোলা চত্বরটাকে ঘুরে দেখলো অর্জুন। জঙ্গলের মাঝখানে চমৎকার জায়গা বেছেছে এরা। ইতিমধ্যে নদীর দিকের পথ দিয়ে আরও চারজন লোক এসেছে। তারা বড়ো তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে সাহেব বলে ডাকার পর একজন কর্তা বেরিয়ে এসেছে। অর্জুন শুনলো লোকটা রিপোর্ট করছে ডেডবডিটাকে নদীর জলে চুবিয়ে ভালো করে পাথর দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ভেসে যাওয়ার কোনোও চান্স নেই।

কর্তাটির গলার স্বর জড়ানো। অদ্ভুত হিন্দি উচ্চারণে লোকটা বললো "খুব ভালো কাজ হয়েছে, কিন্তু তোমাদের এখানে এখন কে আসতে বলেছে। যে জায়গায় ডিউটি দেওয়া হয়েছে সেখানে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।"

"সাহেব, এখন বাগানে কোনোও মানুষ নেই। পুলিশ চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ভয়ে কেউ বাগানে ঢুকবে না, তাই ভাবলাম খবরটা দিয়ে আসি।"

"তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। যা ভাববার আমরা ভাববো। যাও।" কর্তা আবার তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেল। অর্জুনের মনে হলো লোকগুলো এমন ব্যবহার আশা করেনি। তাঁবুর কাছ থেকে কিছুটা সরে এসে তারা একটু গজরাল, তারপর নদীর দিকে চলে গেল।

এবার ফেরা উচিত। ভোর হতে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক বাকি আছে। ভানু ব্যানার্জি অনেক করে বলেছিলেন মিসেস দত্তের সঙ্গে বাগান থেকে চলে যেতে। না গিয়ে ভালো লাভ হলো। অন্তত দারোয়ানের

মৃতদেহের হদিস আর তাঁবুগুলোর অস্তিত্ব অজানা থাকতো তা হলে। অর্জুন ডালপালা সরিয়ে হাঁটতে লাগলো। তাঁবু ছেড়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর তার মনে হলো সে দিক ভুল করেছে। নদীর দিকে যাওয়ার বদলে সে উল্টো দিকে চলে এসেছে। এখানে গাছের তলায় আগাছা বেশি। সে যত হাঁটছে তত ওপরের ডালে বসা বানরেরা হইচই শুরু করে দিয়েছে। এবং তখনই সে টিন পেটানোর শব্দ শুনতে পেলো। দু-তিনটে টিন একসঙ্গে পেটানো হচ্ছে।
এই ঘন জঙ্গলে মানুষ টিন পেটায় জন্তুজানোয়ার তাড়াতে। কিন্তু এত গভীরে এই অসময়ে মানুষ কী করছে? জঙ্গলে যারা চুরি করে কাঠ কাটতে আসে তারা নিজেদের অস্তিত্ব এভাবে জানাবে না। চোরা শিকারীরাও নিঃশব্দে থাকে। মাথার ওপর ঘুম-ভাঙা বানরের দল কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। অর্জুন তাদের এড়াতেই টিনের শব্দ লক্ষ্য করে এগোল। খুটিমারি বেঞ্জে থাকার সময় সে জেনেছিল বাঘজাতীয় হিংস্র পশু এলে বানরেরা এভাবে সারা জঙ্গলকে জানিয়ে দেয়। বানরের চিৎকারে পাখিদেরও ঘুম ভেঙেছে। মুহূর্তেই সমস্ত নৈঃশব্দ্য ভেঙে বাজার হয়ে গেল জঙ্গলটা। অর্জুন অসহায়ের মতো তাকালো। সে বুঝতে পারলো,যারা টিন পেটাচ্ছে তারা বানরের চিৎকার শুনে ভুল করছে। জায়গাটা ছেড়ে যাওয়ার জন্য সে দ্রুত পা চালালো। বানরগুলো পেছন ছাড়ছে না। এ-ডাল থেকে আর এক ডালে অন্ধকারেই লাফাতে লাগলো তারা। অর্জুন টিনের আওয়াজ যেখানে হচ্ছে সেখানে পৌঁছে যেতেই গুলির শব্দ শুনলো। আকাশ কাঁপিয়ে সেই শব্দ জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তেই সব চিৎকার আচমকা থেকে গেল।
একটা মানুষের হাসি শোনা গেল। সে হিন্দিতে বললো, "টিন পেটালে আজকাল কাজ হয় না। শেরগুলো সব চালাক হয়ে গেছে। গুলির আওয়াজে এবার ভাগবে।"
দ্বিতীয় গলা প্রতিবাদ করলো, "সাহেব গুলি ছুঁড়তে মানা করেছিল

কিন্তু !"
"বাঘ খেয়ে গেলে সাহেব আমাদের বাঁচাবে ? যা শুয়ে পড়, এখন আর কোনোও ভয় নেই। আমি জেগে আছি।"
অর্জুন আর-একটু এগোল। তারপরেই তার চোখের সামনে এই অন্ধকারেও দৃশ্যটি অস্পষ্ট ভেসে উঠলো। অনেকটা জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটি খোঁড়া হচ্ছে। প্রায় পুকুরের আদল নিয়ে নিয়েছে জায়গাটা। পুকুরের গায়ে তাঁবু পড়েছে। মনে হচ্ছে শ্রমিকরা সেখানেই রাত্রে থাকে। একটি লোককে বন্দুক হাতে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। অন্ধকারে তার নাক-চোখ বোঝা যাচ্ছে না।
অর্জুনের চোয়াল শক্ত হলো। তাহলে ব্যাপারটা এই। আসল কাজটি হচ্ছে এখানে। এবং বোঝাই যাচ্ছে কাজটি এখনও সফল হয়নি। কিন্তু চারপাশে নেহাতই জঙ্গল, গভীর জঙ্গল। লোকগুলো মাটি খুঁড়ে করছেটা কী ?
ধীরে ধীরে সে সরে এলো। অনেকটা ঘুরে শেষ পর্যন্ত এক কোমর জল পেরিয়ে সে চা-বাগানে পৌঁছল যখন, সূর্যদেব তখন জঙ্গলের মাথায় উঠে বসেছেন। বাংলোয় পৌঁছতে কোনোও বাধা পাওয়া গেল না। গেট খুলে ভেতরে ঢোকার সময় সে ভটভটির আওয়াজ শুনতে পেলো। আড়াল খুঁজতে যাওয়ার মুখে সে মোটরবাইকে বসা ভানু ব্যানার্জিকে দেখতে পেলো। ভানুবাবু হাত তুললেন। তারপর কাছে এসে বাইক থামিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কী অবস্থা ? প্যান্ট ভিজে কেন ? কোথায় গিয়েছিলে ?"
অর্জুন বললো, "তার আগে আপনি বলুন হঠাৎ এত ভোরে ফিরে এলেন কেন ?"
"অস্বস্তিতে। তোমাদের এখানে ফেলে রেখে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। কোনোও সমস্যা হয়নি তো ?"
"সমস্যা নয়, সমাধানের দিকে একটু এগনো গিয়েছে।"
হঠাৎ ভানু ব্যানার্জি চিৎকার করে থামতে বললো তাকে। বাইক

থেকে নেমে এসে ঝুঁকে পড়ে ভানু ব্যানার্জি অর্জুনের পা থেকে টেনে-টেনে যেগুলো ফেলতে লাগলেন সেগুলো ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে। অর্জুন জোঁকগুলো দেখলো। অনেক রক্ত খেয়ে গেছে অসাড় করে। ভানু ব্যানার্জির জুতোর চাপেও মরছে না। ওদের জন্য নুন দরকার।

১৩
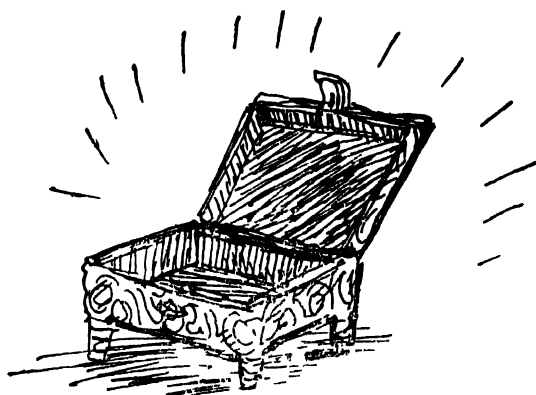
সুভাষিণী চা-বাগানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলোয় বসে চা খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল। মিসেস ব্যানার্জি মমতা দত্তর যত্ন নিয়েছেন। এখন কিছুদিন ঘুম আর বিশ্রাম। এই অবস্থায় তাঁর উচিত চা-বাগানের চিন্তা ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে যাওয়া। কিন্তু তিনি তাতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, চা বাগানটাও তো নিজের, স্বামীর ভালবাসা উদ্যম মেশানো স্মৃতি। তাকে ছেড়ে তিনি কোথাও গেলে শান্তি পাবেন না। মিসেস ব্যানার্জি ইচ্ছেটাকে সম্মান করেছেন। ঠিক হয়েছে কিছুদিন ভদ্রমহিলা এই বাংলোতেই থাকবেন। আজ সকালে এখানে এসেই অমল সোমকে টেলিফোনে খবর দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ির থানায় ফোন করে বলা হয়েছে ওঁকে জানাতে।

মেজর চা শেষ করে বললেন, "আমি আমার সব কথা উইথড্র করছি। এই কেস আমাদের নেওয়া উচিত। তবে এইবেলাটা শরীর রেস্ট

চাইচে।”

অর্জুন মেজরকে দেখলো। ‘আমাদের নেওয়া উচিত’ মানে উনি নিজেকে একজন সত্যসন্ধানী হিসাবে ধরে নিয়েছেন। সে কোনোও কথা বললো না।

মেজরেরমেজাজ চড়া হলো,“হোয়াই চুপচাপ? আমরা কি কাওয়ার্ড ?”

“আপনাকে কেউ কাওয়ার্ড ভাবতে সাহস পাবে না। কাল রাত্রে ঢিল খাওয়ার পর যেভাবে আপনি চেঁচাচ্ছিলেন, বাপস।” অর্জুন মন্তব্য করলো।

“ওরা কাওয়ার্ড, তাই ঢিল মারছিল, সামনাসামনি এলে দেখিয়ে দিতাম।” মেজর বেতের চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন।

ভানু ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি মিস্টার সোমের জন্যে অপেক্ষা করছো ?”

অর্জুন ঘড়ি দেখলো, ‘ঠক তা নয়। ওঁর এখানে পেঁছিতে দুপুর হয়ে যাবে। আমি ভাবছিলাম লোকাল থানাকে কতটা বিশ্বাস করা যায়।”

“কী ব্যাপারে ?”

“এঁদের শক্তি সম্পর্কে ? আমাদের প্রতিপক্ষ খুব তৈরি।”

“তুমি কাল রাত্রে যা দেখেছ তা এখনও থানায় জানাওনি।”

“জানাইনি। তার কারণ এতবড়একটাব্যাপারওখানেএকদিনেঘটেনি। আর সেটা যদি পুলিশ না জানে তা হলে অস্বস্তি হয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিট অফিসাররা জঙ্গলে ঘোরে। তাদের চোখেও পড়বে না তা বিশ্বাস করতে পারছি না। তারা কেন পুলিশকে জানায়নি ? আমি দেখেছি এটা যদি থানায় বলি তা হলে ওদের কাছে খবর যে পেঁছে যাবে না তাই বা বিশ্বাস করবো কীভাবে ?”

“কিন্তু পুলিশ ছাড়া আমরা তো ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না।” ভানু ব্যানার্জিকে চিন্তিত দেখালো। এবং তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ভানু ব্যানার্জি রিসিভার তুললেন, “হ্যালো, ব্যানার্জি

স্পিকিং, ও আপনি, বলুন। হ্যাঁ, ওঁরা আজ সকালেই আমার এখানে চলে এসেছেন। মিসেস দত্ত ভালো আছেন। তাই নাকি? না, না, আমরাই চলে যেতে পারি। নিশ্চয়ই।" একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "নিশ্চয়ই,নিন।" রিসিভারটা তিনি অর্জুনের দিকে এগিয়ে বললেন, "মেঘ না চাইতেই জল।"

ব্যাপারটা না বুঝেই রিসিভারে হ্যালো বললো অর্জুন। সঙ্গে-সঙ্গে ওপারে অমল সোমের গলা বাজলো, "কী ব্যাপার হে, কোনোও খবর না দিয়ে এখানে বসে আছে!"

"আরে আপনি? কোত্থেকে বলছেন?"

"লোকাল থানা থেকে। কাল রাত্রে ফিরলে না, কোনোও খবর নেই দেখে আজ সকালে এস. পি-র সঙ্গে হৈমন্তীপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। তোমার মা ভাবছেন খুব, কবে যে একটু দায়িত্বজ্ঞান হবে!" অমল সোমের গলার বিরক্তি এবার আর চাপা রইলো না।

অর্জুন সেটাকে উপেক্ষা করলো, "বিশ্বাস করুন, কোনোও উপায় ছিল না। একটু আগে হৈমন্তীপুর থেকে ফিরেই আপনাকে খবর দেওয়ার জন্যে জলপাইগুড়ির থানায় ফোন করেছি।"

"ঠিক আছে, মিস্টার ব্যানার্জিকে বলো, আমরা আসছি।" লাইন কেটে দিলেন অমল সোম।

মিনিট চল্লিশেক পরে অর্জুন তার অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয়বার জানাল। প্রথমবার বলতে হয়েছিল ভানু ব্যানার্জি এবং মেজরকে। এখন ওঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অমল সোম এবং এস. পি.। থানার দারোগাকে সঙ্গে আনেননি ওঁরা।

অর্জুন থামলে এস.পি. বললেন, "অদ্ভুত। এ তো সিনেমার চেয়ে সাঙ্ঘাতিক। আমাদের নাকের ডগায় এমন সব কাণ্ড চলছে আর কিছুই জানতে পারিনি?"

অমল সোম বললেন, "হৈমন্তীপুর চা-বাগানে একটার পর একটা খুন কেন হচ্ছে, কেন বাগান বন্ধ, তা নিয়ে কি কখনও ভেবেছেন

এস. পি. সাহেব ?"

এস. পি. একটু থিতিয়ে গেলেন, "আসলে শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে এরকম হয় এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল। আমাদের ফোর্স এখানে করছেটা কী ?"

অমল সোম বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, একবার ডি. এফ. ও-র সঙ্গে কথা বলা দরকার। জঙ্গল এলাকাটা তাঁর। বোঝাই যাচ্ছে নীচের তলার কর্মচারীরা ওঁকে কোনোও খবর দেননি। তবু...।" ভানু ব্যানার্জি সঙ্গে-সঙ্গে অপারেটরকে বললেন জলপাইগুড়ি শহরে ডি. এফ. ও-কে ধরতে। একটু সময় নিয়ে অপারেটর জানালেন, ডি. এফ. ও. শহরে নেই, হলং বাংলোয় আছেন। সেখানকার টেলিফোন কাজ করছে না। অমলবাবুর অনুরোধে ভানু ব্যানার্জি একটা চিঠি লিখে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। সুভাষিণী চা-বাগান থেকে মাদারিহাট হলং-বাংলো মিনিট কুড়ির রাস্তা।

কেউ কিছুক্ষণ কথা বলছিল না। অথচ মেজর ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই একটা চাপা উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়েছেন। মেজরই কথা বললেন প্রথমে, "ওরা কোন্ ভাষায় কথা বলছিল অর্জুন ? মানে ওদের পরিচয় জানার জন্যে জিজ্ঞেস করছি।"

"হিন্দিতে বলছিল।"

"মাই'গড। এ তো জাতীয় ভাষা।" নিঃশ্বাস ফেললেন মেজর, "কিছুই ধরা যাবে না।"

এস. পি. বললেন, "প্রথমে আমরা ডেডবডিটাকে উদ্ধার করবো। জলে পড়ে থাকলে খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "ভুল হবে। আমরা যদি সরাসরি নদীতে গিয়ে মৃতদেহ তুলে নিয়ে আসি তা হলে ওরা অ্যালার্ট হয়ে যাবে। ওরা বুঝবে আমরা ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। অর্থাৎ ওরা যেখানে মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছে সেখানে তো কেউ চট করে খুঁজবে না। তা হলে আমরা জানলাম কীভাবে ?"

ভানু ব্যানার্জি সমর্থন করলেন, "ঠিক কথা। ওদের স্পাই সব জায়-গায় আছে।"

অমল সোম বললেন, "সেইটেই মুশকিল। আমি ভেবে পাচ্ছি না বাইরে থেকে এসে কিছু মানুষ কীভাবে এমন নেটওয়ার্ক তৈরি করলো! আমি একবার মিসেস দত্তের সঙ্গে কথা বলতে চাই ব্যানার্জি সাহেব।"

ভানু ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন। এস. পি. জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আসতে পারি?"

"আসুন। তবে আপনাদের ওপর ওঁর আস্থা কম বলে জেনেছি।"

অমল সোম ভানু ব্যানার্জিকে অনুসরণ করলেন। একটু ইতস্তত করে এস. পি. ওঁদের পেছনে এগোলেন। অর্জুনের ব্যাপারটা ভালো লাগলো না। অমল সোম এক্ষেত্রে তাকে সঙ্গে যেতে বলতে পারতেন। সে এতখানি পরিশ্রম করলো আর মাঝখানে এসে অমল সোম তাকে উপেক্ষা করছেন। চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে তার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। গত রাত্রের ক্লান্তি আচমকা গ্রাস করলো তাকে। আধঘণ্টা সময় কীভাবে কেটে গেছে সে জানে না।

কাঁধে হাতের স্পর্শে জোর করে চোখ মেললো সে, অমলদা হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, "খুব টায়ার্ড হয়ে আছ। একটু বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নাও।"

অর্জুন সোজা হয়ে বললো, "নাঃ ঠিক আছে।" সে দেখলো ঘরে এখন সবাই উপস্থিত। এমনকী, একজন নতুন ভদ্রলোক এসেছেন, মানুষটাকে সে দু-একবার দূর থেকে দেখেছে, এই জেলার ডি. এফ. ও.।

অমল সোম বললেন, "তুমি ঠিক বলছো তো?"

"হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।"

"গুড। শোনো, আমি এখন জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি।"

অর্জুন হতভম্ব, "ফিরে যাচ্ছেন মানে?"

"আর এখানে কিছু করার নেই। এস. পি. সাহেব আছেন, ডি. এফ. ও. এসে গিয়েছেন, তুমি আছ। জাস্ট ওদের আক্রমণ করে কব্জা করা। এর জন্যে আমি থেকে কী করবো। বুঝলে?" অমল সোম খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন।

"কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা ছিল।"

"ও। ঠিক আছে, এসো, আমরা বারান্দায় গিয়ে কথা বলি।" অমল সোম কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা বারান্দায় চলে গেলেন। অর্জুনের এটা খারাপ লাগলো। এত লোক এখানে দাঁড়িয়ে, অন্তত বলে যাওয়া উচিত ছিল। সে বারান্দায় এসে বললো, "ওঁদের না বলে এভাবে বেরিয়ে এলেন।"

"না বলে মানে? ওহো! আমরা কেউ এখানে ভদ্রতা করতে আসিনি। মিসেস দত্ত আমাদের ক্লায়েণ্ট। তাঁর কাজ করতে এসেছি। কী বলছিলে বলো!"

"হৈমন্তীপুর চা-বাগানকে ঘিরে এই যে ব্যাপারটা চলছে তার পেছনে অন্য কারণ আছে। মিসেস দত্ত আমাকে বলেছেন যে তিনি ওদের মুখে জঙ্গলে মন্দিরের খেলা শুনেছেন। আমি নিজে দেখেছি ওরা বিরাট জায়গা খুঁড়ে ফেলেছে।"

"তাতে হলোটা কী?"

"আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, হয়তো কালাপাহাড়ের সম্পত্তি খুঁজতে এরা এসেছে। একটা প্যানিক তৈরি করে বাগানটাকে ডেজার্টেড করে রাখলে ওদের কাজের সুবিধে হয় এবং তাই হচ্ছে।" অর্জুন ব্যস্ত গলায় বললো।

"তুমি 'হয়তো' শব্দটা ব্যবহার করলে না?"

"হয়তো? হ্যাঁ, মানে, অনুমান করছি—।"

"অনুমান তো প্রমাণ নয় অর্জুন। এর আগেও একথা তোমায় বলেছি।"

"কিন্তু লোকগুলো পাহারাদার নিয়ে জঙ্গলের ভেতর মাটি খুঁড়তে

যাবে কেন ?"

"সেটা ওরাই জানে। তুমি কি কোনোও মন্দির অথবা বিল দেখেছ ?"

"বিল এদিকে নেই। কালাপাহাড়ের সময়ে যদি থেকে থাকে তা হলে চা-বাগান তৈরির সময় তা বুজিয়ে ফেলা হতে পারে।"

"মন্দির ?"

"না, দেখিনি। অত রাতে অন্ধকারে ভালো করে কিছুই দেখা যায়নি। মন্দির থাকলেও আমার চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু মিসেস দত্তের স্টেটমেণ্ট অনুযায়ী ওরা মন্দিরের কথা বলেছে যখন, তখন সেটা থাকবেই।"

"ঠিক আছে। আজ তোমরা দিনের আলোয় যাচ্ছ, থাকলে দেখতেই পাবে।"

"অমলদা, আপনি প্রথম থেকেই এমন ডিসকারেজ করছেন কেন ?"

প্রথম থেকে আবার কী করলাম।" অমল সোম হাসলেন, "আমাদের দু'জনের উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা। তুমি একটা সত্যি কিছু-তেই ভাবতে পারছো না যে, কালাপাহাড় কোথায় কোন্ বনের বিলের ধারে মন্দিরের গায়ে মাটির নীচে তার সম্পত্তি লুকিয়েছিল তা এই লোকগুলো জানবে কী করে ? খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার চেয়েও ব্যাপারটা কঠিন। আমি যে কাগজপত্র দেখেছি তাতে কোনোও নির্দিষ্ট এলাকার কথা বলেনি। হরিপদ সেন মনে করেছিলেন উত্তর বাংলাই সেই জায়গা। তা উত্তর বাংলায় তো জঙ্গলের অভাব নেই। ওঁর প্রতিপক্ষ কী করে এই বৈকুণ্ঠপুরকে শনাক্ত করলো ? যুক্তি দাও।"

অর্জুন জবাব দিতে পারলো না। হরিপদ সেনের প্রতিপক্ষ এমন সুনির্দিষ্ট খবর পেলো কী করে ? সে মাথা নাড়লো, "আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন কিন্তু ওরা ওইরকম লুকিয়ে-চুরিয়ে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে কেন ?"

"এর উত্তরটা ওখানে না গেলে পাওয়া যাবে না। বেশ, তুমি যখন

চাইছো তখন আমি তোমাদের সঙ্গী হচ্ছি। আমার কাছে মৃত কালা-পাহাড়ের সম্পত্তি থেকে জীবিত কালাপাহাড়কে খুঁজে পাওয়া অনেক বেশি জরুরি।" অমল সোম ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

"জীবিত কালাপাহাড়?" পেছন-পেছন আসার সময় প্রশ্ন করলো অর্জুন।

"হরিপদবাবুকে হুমকি দেওয়া চিঠির কথা ভুলে গেলে কী করে!" ঘরে ঢুকে অমল সোম বললেন, "নাঃ, যাওয়া হলো না, আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি সঙ্গী হচ্ছি।"

এস. পি. গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। বললেন, "আমি ডি. এফ. ও-র সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। কিছু লোক জঙ্গলের মধ্যে জোর করে জায়গা দখল করে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছে। অবশ্যই এটা অন্যায়। এই অপরাধে আমরা ওদের গ্রেপ্তার করতেও পারি। কিন্তু হৈমন্তী-পুর চা-বাগানের খুনগুলোর সঙ্গে ওদের জড়াবার কোনোও প্রমাণ আমার হাতে নেই। আর ওরা তো রয়েছে চা-বাগানের সীমার বাইরে।"

অমল সোম বললেন, "ঠিক কথা। তা হলে ওদের জঙ্গল দখল করার অভিযোগেই গ্রেপ্তার করুন। পুরো দলটাকেই আমাদের চাই।"

"কিন্তু কী লাভ হবে। কোর্টে তুললেই বেল নিয়ে যাবে। এটা নন-বেলেবল অফেন্স নয়।"

"কোর্টে তোলার আগে আমারা ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব, তাই যথেষ্ট।"

ঠিক হলো সাঁড়াশি আক্রমণ হবে। হৈমন্তীপুর চা-বাগান, নদী পেরিয়ে একদল ঢুকবে। অন্যদল আসবে বিপরীত দিকের জঙ্গল পেরিয়ে। ডি. এফ. ও-কে অর্জুন জায়গাটার আন্দাজ দিতে তিনি ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিলেন জঙ্গলের কোন্ অংশ দিয়ে ঢুকতে হবে। অর্জুনের অনুমান, ওদের দলে অন্তত জনা পনেরো মানুষ আছে। এরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র, সতর্ক। যেভাবে ওরা মৃতদেহ সরিয়েছে

তাতে দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এদের কব্জা করতে হলে অন্তত কুড়িজন সেপাই চাই। এস. পি. এই অঞ্চলের দুটো থানার অফিসারকে নির্দেশ দিলেন। বেশ সাজসাজ আবহাওয়া শুরু হয়ে গেল। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযানে যেতে চাইলেন। অমল সোম আপত্তি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি সুভাষিণী চা-বাগানের ম্যানেজার। অন্য একটি চা-বাগানের সমস্যায় আপনি জড়াচ্ছেন কেন ?"

"সমস্যাটা আমার বাগানেও ছড়াতে পারে মিস্টার সোম। তা ছাড়া যে মানুষ হিমালয়ে ওঠে সেই মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন অভিযানে না গিয়ে কি পারে ?"

"বেশ। তা হলে এক কাজ করা যাক। এস. পি. সাহেব, আপনি প্রথমেই হৈমন্তীপুরে যাওয়া-আসার পথটাকে সিল করুন। ওখানকার সাঁকো ভাঙা। মোটর বাইক ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয়। এতো লোকের জন্য বাইক জোগাড় করা সম্ভবও না। আপনি জনা দশেক সেপাই নিয়ে বাগান পেরিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে যান। মিস্টার ব্যানার্জি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। আমি ডি. এফ. ও-র সঙ্গে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঢুকছি বাকিদের নিয়ে।"

এই প্রথম মেজর কথা বললেন, "অর্জুন কোন্ দলে যাচ্ছে ?"

"ও আমার সঙ্গে যাবে।" অমল সোম জানালেন।

"আর আমি ?" চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন মেজর।

"আপনি হেডকোয়ার্টার্সে থাকুন। মানে এখানে। একজনের তো পেছনে থাকা দরকার।"

১৪
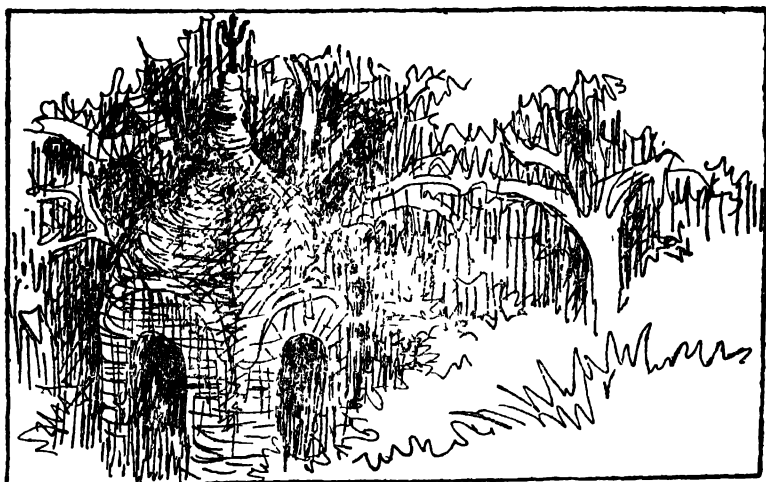
ডি. এফ. ও. যে আন্দাজ দিয়েছিলেন তাতে বৈকুণ্ঠপুর চা-বাগানের গা-ঘেঁষা জঙ্গলের উলটো দিকের কাছাকাছি সরকারি রাস্তা অন্তত মাইল তিনেক দূরে। জঙ্গলের মাঝখানে সিঁথির মতো পিচের পথ চলে গিয়েছে। দিনে চারবার বাস যায় এই পথে।

ডি. এফ. ও.-র জিপে ওরা যে-জায়গায় নামলো সেখানে শুধু ঝিঁঝির ডাক আর গাছের ঘন ছায়া। গাছগুলো যেন আকাশছোঁয়া গা জড়িয়ে অজস্র পরগাছা ঝুলে থেকে কেমন রহস্যময় করে তুলেছে। ডি. এফ. ও.-র সঙ্গে ওই অঞ্চলের রেঞ্জার ছিলেন। দু'জন বিট অফিসার আর জনা আটেক সেপাই। জানা গিয়েছিল দুটো থানায় হাতের কাছে এখন পনেরোজনের বেশি সেপাই পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ সশস্ত্র পনেরোজনের সঙ্গে লড়াই হবে এ-পক্ষের পনেরোজনের। অর্জুনের হাতে কোনোও অস্ত্র নেই। ডি. এফ. ও. অথবা অমলদা

সঙ্গে কিছু রেখেছেন কি না তা অর্জুনের জানা নেই।

গাড়ি থেকে নেমে ডি. এফ. ও. বললেন, "ওই যে দেখুন, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের জিপ অথবা কণ্ট্রাক্টারদের লরি যাওয়ার কাঁচা পথ আছে। ইচ্ছে করলে ওই পথ ধবে আমরা আরও মাইল দুয়েক এগিয়ে যেতে পারি।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "মাইলখানেক এগিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে। কারণ গাড়ির শব্দ বেশি দূরে না যাওয়াই ভালো।"

অতএব জিপগুলো জঙ্গলে ঢুকলো। এই দিনদুপুরেও কেমন গা-ছমছম-করা ভাব জঙ্গলের ভেতরে। দু'পাশের ডালে বসে বানর আর পাখিরা সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে। জিপ চলছিল ধীর গতিতে, কারণ এদিকের রাস্তা খুবই অসমান। মাঝে-মাঝেই বানরগুলো সাহস দেখিয়ে রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ছিল। ডি. এফ. ও. হেসে বললেন, 'এদের সাহস দেখছি খুব বেড়ে গিয়েছে।"

অমল সোম বললেন, "রোজ আপনাদের জিপ দেখছে, সাহস তো বাড়বেই।"

ডি. এফ. ও. বললো, "আমাদের জিপ রোজ এদিকে আসে না।"

ঠিক মাইলখানেক যাওয়ার পর ডি. এফ. ও. জিপ থামাতে বললেন। এদিকে জঙ্গল আরও ঘন। একটা মাঝারি কাগজ সামনে রেখে তাতে কয়েকটা রেখা এঁকে বললেন, "এই জায়গাটা আমরা জানি। আর অর্জুনবাবুর কথা ঠিক হলে এধারে আমাদের পেঁছিতে হবে। মাইল দেড়েক পথ। অবশ্য পথ করে নিতে হবে।"

অমল সোম ঘাড় নাড়লেন, "ঠিক আছে। জিপগুলো এখানেই থাক। আমরা দুটো দলে এগোব। আমি আর অর্জুন পাঁচ মিনিট আগে রওনা হচ্ছি। আপনি বাকিদের দিয়ে আসুন। ওদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পেঁছে যদি আমাদের দেখা না পান তা হলে একটু অপেক্ষা করবেন। আমি তিনবার শিস দেব। শিস শুনলে আপানারা চার্জ করবেন।'

ডি. এফ. ও. মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, "কিন্তু আমরা পেঁছিবার আগেই যদি এস. পি. ওপাশ থেকে অ্যাটাক শুরু করেন? অমল সোম ঘড়ি দেখলেন, "না। ওঁকে আমি একটা সময় দিয়েছি। তার আগে উনি বাংলো ছেড়ে নদীর দিকে এগোবেন না। আমি চেষ্টা করবো একই সময়ে দু'দিক থেকে আক্রমণ করতে। আপনি বাকিদের নির্দেশ দিন যাতে নিঃশব্দে এগোতে পারে।"

ডি. এফ. ও.-র সঙ্গে সশস্ত্র মানুষেরা রয়েছে কিন্তু অর্জুন জানে না অমল সোমের সঙ্গে কোনোও অস্ত্র আছে কি না। সে নিজে তো নিরস্ত্র। কিন্তু অমলদা ইঙ্গিত করামাত্র সে এগিয়ে চললো। লতানো ডালপাতা সরিয়ে অমল সোম ক্ষিপ্রগতিতে এগোচ্ছিলেন। অর্জুনের মনে হলো বয়স অমলদাকে একটুও কাবু করেতে পারেনি। শ'খানেক গজ যাওয়ার পর অমল সোম দাঁড়ালেন। কান পেতে কিছু শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই পায়েচলা পথ আছে, একটু খোঁজো তো! এভাবে জঙ্গল ফুঁড়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। পেলে জোরে শিস দেবে।"

কথাটা নিজেই বলবে বলে ভাবছিল অর্জুন। ওরা এখন বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। অমল সোম এবার ডান দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, সে বাঁ দিকে। প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হচ্ছে যাতে জোঁক না ধরে। একটু বাদে পেছন ফিরে তাকিয়ে অমল সোমকে দেখতে পেলো না অর্জুন। এদিকটায় বোধহয় বানরেরা নেই, শুধু পাখির ডাকের সঙ্গে ঝিঁঝি পাল্লা দিচ্ছে। মিনিট দশেক জঙ্গল ভেঙে কাহিল হয়ে পড়লো সে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে চারপাশে তাকালো। হঠাৎ মনে হলো চারপাশের এই সহজ সবুজের মধ্যে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া আর ঠাকুরঘরের পবিত্র আবহাওয়ায় ধূমপান করা একই ব্যাপার। শহরের দূষিত পরিবেশে যে চিন্তাটা মাথায় আসে না এখানে প্রায় আদিম পরিবেশে সেট প্রকট হওয়ায় অর্জুন প্যাকেটটা পকেটেই রেখে দিলে।

কয়েক পা এগিয়ে যেতে সরসর আওয়াজ হলো। একটা সাদা খরগোশ জুলজুল করে তাকে দেখছে। অর্জুন একটু ঝুঁকতেই সেটা বিদ্যুতের মতো পাশের গর্তে ঢুকে পড়লো। এগিয়ে চললো সে। এই জঙ্গলে একসময় বাঘেরা সংখ্যায় বেশি ছিল। এখনও কিছু আছে, তবে সচরাচর তাদের দেখা যায় না। কিন্তু বাইসন, বুনো শুয়োর, চিতা আর হাতির সংখ্যা প্রচুর। সে যে এভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাতে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু জিপে আসার সময় ডি. এফ. ও, বলেছেন সাধারণত দিনের বেলায় এই অঞ্চলে হিংস্র জন্তুদের দেখা বড় একটা পাওয়া যায় না।

হঠাৎ চোখের সামনে আট ফুট চওড়া একটা পথ ভেসে উঠলো। জঙ্গল কেটে এই পথ করা হয়েছে কিন্তু অযত্নের ছাপ রয়েছে সর্বত্র। পথটা চলে গিয়েছে জঙ্গলের আরও ভেতরে। অর্জুন পথটার ওপর এসে দাঁড়ালো। এবং তখন তার নজরে এলো গাড়ির চাকার দাগ। সে ঝুঁকে দেখলো। এই পথে প্রায়ই গাড়ি চলে, একটা দাগ তো রীতিমত টাটকা। এই পথ নিশ্চয়ই হাইওয়ে থেকে বেরিয়েছে। ওরা যে পথ দিয়ে জিপে করে জঙ্গলে ঢুকেছে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনোও সংযোগ নেই। সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগে এই পথ ধরে একবার পিছিয়ে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছিল কোথায় প্রবেশ পথ। সে জোরে শিস দিলো দু'বার।

মিনিট তিনেকের মধ্যে আরও কয়েকবার শিস দেওয়ার পর অমল সোমের দেখা পাওয়া গেল। রাস্তায় পা দিয়ে তিনি বললেন, "বাহ। সুন্দর। আমি ভাবছিলাম লোকগুলো এত কষ্ট করে তো রোজ যাওয়া-আসা করতে পারে না। প্রয়োজনেই মানুষ পথ করে নেয়। ওরাও নিয়েছে। ভালো, খুব ভালো।"

"রাস্তাটা কোত্থেকে বেরিয়েছে দেখা কি দরকার ?"

"পেছনে তাকিয়ে কোনোও লাভ নেই। আমাদের সঙ্গীরা ততক্ষণে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু কথা হলো যারা সমস্ত চা-বাগানে জাল বিছিয়ে

রেখেছে তারা এমন একটা রাস্তা কি বিনা পাহারায় রাখবে ?”

সন্দেহ হচ্ছিল অর্জুনেরও। কিন্তু পাহারাদাররা কাছে পিঠে থাকলে ঘন জঙ্গলের আড়াল তাদের নিশ্চিন্তে রেখেছে। হাঁটা শুরু করে অমল সোম বললেন. “আমাদের ডি. এফ. ও. সাহেব নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন, বুঝেছ ? তাঁর জঙ্গলে বাইরের লোক গাড়ি চড়ার রাস্তা বানায় অথচ তিনি কিছুই জানেন না।”

অর্জুন অমল সোমকে একবার দেখলো। আজকাল অমলদা এমন করে সাধারণ কথা বলেন যে, মনেই হয় না উনি অতবড সত্যসন্ধানী। অমলদার কী বয়স বাড়ছে ? নইলে সব জেনেশুনেও তিনি সুভাষিণী বাগান থেকে চলে যেতে চাইছিলেন কেন ? কথাটা সে না বলে পারলো না। অমল সোম হাসলেন, “এখন তো তেমন কিছু কাজ নেই। ঘিরে ধরে আটক করা। তাই চলে যেতে চেয়েছিলাম। পরে মনে হলো লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য থাকা যেতে পারে। এত জায়গা থাকতে ঠিক এখানেই যে কালাপাহাড তার সম্পদ লুকিয়েছে এই খবরটা পেলো কী করে ? নিশ্চয়ই ওর ইতিহাস ভালো জানা আছে। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে।”

হঠাৎ একটা তীব্র বাঁশির শব্দ শোনা গেল। ফুটবল ম্যাচের শেষ বাঁশির চেয়েও দীর্ঘ। তারপরেই গুলির শব্দ। খুব কাছেই। সেই-সঙ্গে মানুষের আর্তনাদ। অমলদা চাপা গলায় বললেন, “চটপট কোনোও গাছে উঠে পড়ো।”

হাতের কাছে যে গাছ তার সারা গায়ে এত শ্যাওলা যে, হাত দিতেও ঘেন্না হয়। সে দ্রুত রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়লো। ওপাশে গুলির শব্দ এবং সেইসঙ্গে মানুষের চিৎকার চলছে। দুপ-দাপ পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। অর্জুন আর-একটু এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেলো জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে। ডি.এফ.ও. সাহেব সমেত পুরো বাহিনী, যারা তাদের সঙ্গে এ-পথে এসেছিল, তারা করুণ মুখে দাঁড়িয়ে। ওদের ঘিরে রেখেছে জনা আটেক অস্ত্রধারী।

একজন বন্দিদের হাত বাঁধার কাজে ব্যস্ত। ওদের নেতা বলে যাকে মনে হচ্ছিল সে ডি এফ.ও.কে একটার-পর-একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছে। ডি.এফ.ও. মাঝে-মাঝে জবাব দিচ্ছেন।

একসময় বাঁধার কাজ শেষ হয়ে গেলে বন্দিদের লাইন করিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। অর্জুন দেখলো আরও দু'জন লোক পাহারায় থেকে গেল। ডি. এফ. ও. কী করে ধরা পড়লেন? ওঁর সঙ্গীরা অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগই পেল না? অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু আপাতত তাদের দলগত শক্তি কমে গেল। এবার এস.পি. ওপাশ থেকে আক্রমণ করলে ওরা স্বচ্ছন্দে এদিক দিয়ে পালাতে পারবে। হঠাৎ হাত কুড়ি দূরের জঙ্গলটাকে একটু নড়তে দেখলো সে। পাহারাদারদের নজর সেদিকে নেই। অর্জুন অনুমান করলো সোম ওই দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এবং এভাবে এগনোর মানে হলো ওই লোক দুটোর মুখোমুখি হওয়া।

পাহারাদারদের একজন বিড়ি ধরাবার জন্য বন্দুক দুই পায়ের মাঝ-খানে রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল। দ্বিতীয়জন মুখ তুলে গাছের ডাল দেখ-ছিল। দেখতে-দেখতে বললো, "আজ রাত্রের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। ওরা কী করে চলে এলো বলো তো?

প্রথমজন বিড়ি ধরিয়ে বললো, "জানি না। কিন্তু এটা আমার ভালো লাগছে না। ওরা যদি কাল এই সময়ে আসতো তা হলে ভালো হতো। আমাদের কাউকে পেত না।"

"সব ক'টাকেই তো ধরা হয়েছে। কাল অবধি থাক বন্দী হয়ে।"

"সব ক'টাই যে ধরা পড়েছে তা কে বলতে পারে!"

"যাবে কোথায়? এগোতেই নজরে পড়ে যাবে।"

"পিছিয়ে আবার থানায় খবর দিতেও তো পারে।"

"তুমি ভাই বড্ড বেশি ভয় পাও। রোজগার করতে গেলে অত ভয় পেলে চলে না। আজকের রাতটা কাটলেই সব ঢুকে যাবে যেখানে সেখানে।" লোকটা কথা শেষ করলো না। অর্জুন এগোচ্ছিল। এবং

সে চকিতের জন্য অমল সোমকে দেখতে পেলো।
প্রায় একই সময়ে দু'জন আক্রমণ চালালো। লোক দুটো কিছু বোঝার আগেই মাটিতে পড়ে গেল। দু'জনেই অসতর্ক ছিল। ওদের উপুড়করে শুইয়ে ঘাড়ের পাশে মৃদু আঘাত করতেই চেতনা হারালো। এর পর খুব দ্রুত ওদের পোশাক ছিঁড়ে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে বাকিটা দিয়ে হাত এবং পা বেঁধে ফেলা হলো। অমলদাকে অনুসরণ করে অর্জুন তার শিকারকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল ঝোপের মধ্যে।
কাজ শেষ করে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি মনে হচ্ছে ওরা রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিয়েছে?"
"কী জানি। এরা তো কোনোও প্রতিরোধ তৈরি করতে পারলো না!"
"তা হলে ডি.এফ. ও.-র বাহিনীকে ধরলো কী করে? খোঁজ নিয়ে দ্যাখো এরা নিশ্চয়ই এক্স-পুলিশম্যান। এই রাজ্যের না হলে পাশের রাজ্যের। চলো।"
বোঝা যাচ্ছে এতবড় জঙ্গলের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখার মতো পাহারাদার এদের নেই। অমলদা ঘড়ি দেখছিলেন। এমনিতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। এস. পি-র আক্রমণের সময় থেকে তাঁরা বেশ পিছিয়ে পড়েছেন। তবু অর্জুনের একটু ভালো লাগছিল। এতক্ষণ ছিল খালি হাতে, এখন লোক দুটোর অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সবসুদ্ধ চারটে গুলি বন্দুক পিছু বরাদ্দ হয়েছিল বোধহয়। এরা ডি. এফ. ও.-র বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেনি বলে বাঁচোয়া।
যে পথে বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই পথটাই ধরেছিলেন অমলদা। প্রায় কাছাকাছি আসার পর তিনি বললেন, "তুমি ডান দিকে এগোও। ওই গাছটায় উঠে বসো। আমরা এস.পি. সাহেবের জন্য অপেক্ষা করি। আমি বাঁ দিকে আছি।
সময় চলে যাচ্ছিল। অর্জুন ঘড়ি দেখলো। এস. পি. সাহেবের যে সময়ে আসার কথা তার থেকে প্রায় কুড়ি মিনিট ঘড়ির কাঁটা বেশি

ঘুরে গেছে। ব্যাপারটা কী ঘটেছে সে বুঝতে পারছিল না। গাছের যে ডালটায় সে বসে ছিল, তার অনেকটাই পাতায় ছায়াও। বসতেও আরাম লাগছে। কিন্তু গত রাত্রের পরিশ্রমের পর এইরকম আরাম-দায়ক জায়গায় বসে থাকা অত্যন্ত ঝুঁকি নেওয়া হবে। ঘুম এগিয়ে আসছে গুড়ি মেরে। সেটা টের পেতেই অর্জুন নিজেকে সবল করার জন্য আর-এক ধাপ ওপরে উঠলো। বেকায়দায় শরীর রাখলে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। এবার তার দৃষ্টি গাছের মাথা ছাড়াতে পেরেছে অনেকটাই। প্রথমেই দূরে সরু ফিতের মতো জল চোখে পড়লো। চা-বাগানের গা ঘেঁষে যে নদীটা চলে গিয়েছে, যেটা পার হয়ে এই জঙ্গলে সে এসেছিল সেটা অনেক নীচে বাঁক নিয়েছে। সে চোখ সরালো। অনেকটা ন্যাড়া জায়গা, কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। পাশে দুটো গাড়ি, একটা জিপ অন্যটা অ্যাম্বাসাডার। অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লো। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে জিপ আর অ্যাম্বাসাডার মানে ওটাই শত্রু শিবির। জায়গাটা মোটেই দূরে নয়। মানুষগুলোকে এখান থেকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না। অমল সোম যেদিকে আছেন সেখান থেকে এই দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। অর্জুনের ইচ্ছে হলে গাছ থেকে নেমে অমল সোমকে ডেকে এনে দৃশ্যটা দেখায়। সে আর-একটু নজর সরাতেই চোখ ছোট হয়ে এলো। ওটা কী ? মন্দির-মন্দির মনে হচ্ছে। গাছের আড়ালে কি মন্দিরের চূড়ো ? আবছা হলেও খানিক-ক্ষণ লক্ষ্য করার পর আর সন্দেহ রইল না। শ্যাওলা পড়ে-পড়ে প্রায় কালচে হয়ে গিয়েছে মন্দিরের চূড়ো। না, আর সন্দেহের অবকাশ নেই। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল, শিব মন্দির। তাজ্জব ব্যাপার হলো আজ দেশের সবরকমের জঙ্গল বনবিভাগের নদদর্পণে। বন-বিভাগ নিশ্চয়ই জানে কোথায় কী আছে। এই মন্দিরের অস্তিত্ব তাঁদের অবশ্যই জানা আছে। কিন্তু ডি.এফ.ও-র সঙ্গে আলোচনার সময় বোঝা গিয়েছিল ব্যাপারটা তিনি জানেন না। হয়তো বেশি-দিন এ-জেলায় আসেননি অথবা জঙ্গলের কোনো প্রান্তে একটা ইটের

চূড়ো আছে কি নেই তা তাঁকে জানানোর প্রয়োজন অধস্তন কর্মচারীরা মনে করেনি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো এই মন্দির খুঁজে বের করা। হরিপদ যে অনুমান করেছিলেন কালাপাহাড় তাঁর সম্পদ উত্তর বাংলায় লুকিয়ে রেখে গেছেন। কোচবিহারের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের পর সেটা সম্ভব বলে মনেই হতে পারে। কিন্তু উত্তর বাংলা মানে কয়েকশো মাইল জুড়ে জঙ্গল আর মন্দিরের পর মন্দির।

ধীরে-ধীরে অর্জুন নীচে নেমে এলো। এবং তখনই পায়ের আওয়াজ কানে এলো। কেউ পাতা মাড়িয়ে আসছে। যদিও এখন সে সশস্ত্র তবু মুখোমুখি হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যতটা সম্ভব নিজেকে গাছের আড়ালে রেখে সে শুনলো শব্দটা খুব কাছ দিয়েই তাকে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে লোকটি চলেছে সে খুব নিশ্চিন্ত, কিছু খোঁজার তাগিদ তার নেই। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল অর্জুন। খানিকটা দূরত্ব রেখে সে অনুসরণ শুরু করলো, শব্দটির সঙ্গে পা মিলিয়ে।

মিনিটখানেক হাঁটার পরেই লোকটাকে দেখা গেল। কাঁধে একটা লাঠি নিয়ে খোশ মেজাজে হেঁটে চলেছে। একে পেছন থেকে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে মোটেই অন্য বন্দুকধারীদের মতো মনে হলো না। বরং চেহারায় এ-দেশীয় মানুষের ছাপ স্পষ্ট।

লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। এপাশে-ওপাশে তাকালো। তারপর নিচু হয়ে এগিয়ে চললো। ওর এগোবার ভঙ্গিতে যথেষ্ট সতর্ক ভাব ফুটে উঠেছে এবার। আর তখনই গুলির শব্দ শুরু হয়ে গেল। শব্দ ভেসে আসছে নদীর দিক থেকে। পোর্টেবল লাউড স্পিকারে এস.পি.-র গলা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। এদিক থেকে গুলি ছোঁড়া এখনও শুরু হয়নি।

অর্জুন দেখলো গুড়ি মেরে এগিয়ে যেতে-যেতে এইসব শব্দ কানে যাওয়া মাত্র হকচকিয়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়েছে। দু'পাশে আগাছার ঝোপ থাকায় তাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সে যে আর নড়ছে না এটাও ঠিক। অর্জুনের মনে হলো লোকটা এই দলের কেউ নয়।

অথচ বাইরের লোক জঙ্গলের এত গভীরে স্বচ্ছন্দে হেঁটে আসেই বা কী করে? নিশ্চয়ই এটা ওর প্রথম আসা নয়। অন্যদিন যখন এসেছে তখন বাধা পায়নি কেন? গোলমাল লাগছে এখানেই।

হঠাৎ অর্জুন ভূত দেখলো যেন। নাকি অর্জুনকে ভূত বলে মনে হলো লোকটার। যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসতেই সে দেখলো একজন মানুষ বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে। এক মুহূর্ত দেরি না করে সে হাঁটু মুড়ে বসে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দিলো। তার গলায় দিশি ভাষা। সে কিছু জানে না। তাকে ছেড়ে দিলে সে সোজা নিজের ঘরে ফিরে যাবে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম কী?"

"মাংরা।"

"এখানে কী করতে এসেছ?"

লোকটা চুপ করে রইলো। এবার ওদিকে প্রত্যাঘাত শুরু হয়েছে। গুলিগোলার শব্দ খুব কাছেই এগিয়ে এসেছে। এই শব্দে লোকটা কুঁকড়ে যাচ্ছিল। অর্জুন হাতের বন্দুক ছেড়ে হুকুম করলো, "তুমি যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে চলো।"

"নেহি নেহি। আমাকে ছেড়ে দাও।" লোকটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছে।"

"তুমি যদি আমার কথা শোনো তা হলে বেঁচে যাবে। নইলে—। চলো।"

লোকটা সম্ভবত তার মতো করে পরিস্থিতিটা বুঝলো। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে হাঁটা শুরু করলো গুড়ি মেরে। অর্জুন বুঝতে পারছিল না এতটা পথ সহজভাবে এসে ও এখান থেকে গুড়ি মারা শুরু করেছিল কেন? ও কি বুঝতে পেরেছিল কেউ অনুসরণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে চলার ধরন বদলেছিল? এটা ঠিক হলে…।

অর্জুন দেখলো একটা বড় পাথর দু'হাতে সরাচ্ছে লোকটা। কিছু-ক্ষণ চেষ্টার পর সেটা সরতেই বেশ বড় সুড়ঙ্গ স্পষ্ট নজরে এলো।

১৫

সুড়ঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা এবার অর্জুনের দিকে তাকালো। অর্জুন ইশারা করতে সে মাথা নুইয়ে ভেতরে ঢুকলো। একটু বাদে তাকে আর দেখা যাচ্ছিলো না। যে-কোনোও সুড়ঙ্গের মতো এর ভেতরটা বেশ অন্ধকার। কোনোরকম আলোর সাহায্য ছাড়া ওখানে পা বাড়াতে ঠিক সাহস হচ্ছিলো না অর্জুনের। সুড়ঙ্গের মুখ যদি ওপাশে কোথাও থাকে তা হলে এই লোকটি, যার নাম মাংরা, স্বচ্ছন্দে এই সুযোগে পালিয়ে যেতে পারবে। অবশ্য ওকে ধরে রেখেই বা তার কী লাভ!

অর্জুন ইতস্তত করছিল। গুলিগোলা চলছে ওপাশে। অবিরাম শব্দ বাজছে। যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে নির্জন জঙ্গল। অর্জুন সুড়ঙ্গের দিকে তাকালো। এটা কে বানিয়েছে? এরাই? যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে নতুনের চেহারা নেই। হঠাৎ কাছাকাছি মানুষের উত্তেজিত

গলা শোনা গেল। লোকগুলো এদিকেই আসছে। কোনোও পথ না পেয়ে অর্জুন দ্রুত সুড়ঙ্গে নামলো। নেমেই মনে হলো লোকগুলো এখানে এলেই সুড়ঙ্গটাকে দেখতে পাবে। ইঁদুরের মতো অবস্থা না হয় তখন! পেছন থেকে মাংরার গলা পেলো অর্জুন, "পাথরটা টেনে আনুন মুখে, জলদি।"

অতএব বন্দুক রাখতে হলো। সুড়ঙ্গের মুখে রাখা পাথরটাকে কোনো-মতে টেনে এনে আড়াল তৈরি করতেই ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল। এক বিঘত দূরের কোনোও জিনিস দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন হাতড়ে-হাতড়ে বন্দুকটাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলো। পেতে মনে সামান্য ভরসা এলো। সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কোথায়?"

"এখানে বাবু।" তৎক্ষণাৎ সাড়া পাওয়া গেল।

"আমার দিকে এগোবার চেষ্টা একদম করবে না।"

"আপনার দিকে যাব কেন? আপনি বরং আমার পেছনে আসুন।"

অর্জুন ঢোক গিললো, "দাড়াও। তোমার পেছনে যাব যে, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটা টর্চ যদি সঙ্গে থাকত!"

"টর্চ কেনার পয়সা কোথায় পাব বাবু। আমার এখানে হাঁটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার চোখ ঠিক সয়ে নেবে।" লোকটা হাসলো।

কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না অথচ কথা হচ্ছে। মাটির ওপরে কী ঘটছে তা এখানে দাঁড়িয়ে বোঝার উপায় নেই। অবশ্য দাঁড়ানো শব্দটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। কোমর অনেকখানি ভেঙে মাথা নুইয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে এখন। অর্জুন দেখলো এখন অন্ধকার যেন আগের চেয়ে অনেক পাতলা কিন্তু দেখে পথ চলার মতো নয়। একটা মানুষের আদল কি তার সামনে ফুটে উঠছে? সে ঠিক নিশ্চিত হতে পারলো না। অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এই সুড়ঙ্গটা ভালো চিনলে কী করে?"

লোকটা হাসলো, "এখনকার কথা নাকি ? সেই ছেলেবেলা থেকে চিনি। জঙ্গলে খেলা করতে এসে একদিন খুঁজে পেয়েছিলাম।"
"সুড়ঙ্গটা কোন্‌দিকে গিয়েছে ?"
"মন্দিরে।"
"মন্দির মানে শিবের মন্দির ?" অর্জুনের গলার স্বর প্রতিধ্বনিত হলো।
"কী জানি। দেবতা-টেবতা কিন্তু নেই ওখানে।" লোকটা যেন পিক করে থুতু ফেললো।
"এখানে যে সাড়ঙ্গ আছে তা তোমাদের গ্রামের সবাই জানে ?"
"না। আমরা দুই বন্ধু জানতাম।"
"সে কোথায় ?"
"মরে গিয়েছে। সাপের কামড়ে। এখানে আসার সময়ে।"
"কবে ?" অর্জুনের শরীর শিরশির করলো। এখানে এখনও সাপ থাকা আশ্চর্যের নয়।"
"সে অনেকদিন আগের কথা। আমি আর কাউকে বলিনি।"
"কেন ?"
"বললেই তো সবাই জেনে যাবে। এটা আর আমার থাকবে না।"
"তোমার থাকবে না মানে ?"
"এই গুহাটা এখন আমার একার।" এবার লোকটার গলা বেশ গম্ভীর শোনালো।
"তুমি এখানে কী করো ?"
"মালপত্তর রাখি।"
কিসের মালপত্তর ?"
"সেটা বলা যাবে না।" লোকটার হাসি শোনা গেল। "তবে এখন তো বন্দুক দেখিয়ে আপনি জেনে গেলেন।"
"তুমি কি চুরিচামারি করো ?"
লোকটা কোনো জবাব দিলো না। প্রশ্নটা করেই অর্জুনের মনে হলো,

না করাই ভালো ছিল। লোকটা তাকে পছন্দ করছে না। এর ওপর সে বেকায়দায় ফেলতে চাইছে বুঝে যদি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে তা হলে এই অন্ধকারে সে কিছুই করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। অর্জুন একটু হাসার চেষ্টা করলো, "তুমি এখানে রোজ আসো ?"

"না। দরকার পড়লে আসি।"

"এখানে কিছু বাইরের মানুষ আস্তানা গেড়েছে। তারা তোমাকে বাধা দেয়নি ?"

"দিয়েছিল। আমাকে বলেছে এদিকে না আসতে।"

"তারপরে ?"

"আমার দরকার পড়ে তাই আসি। ওরা বললেই শুনবো কেন ?"

"আজকেও তো বাধা দিতে পারতো।"

"দিলে চলে যেতাম। কালও ফিরে গিয়েছি।"

"এরা এখানে কতদিন আছে ?"

"এক মাস হয়ে গেল।"

"তোমাদের গ্রামের সবাই জানে ?"

"জানবে না কেন ? মোড়লকে টাকা দেয় কাজ করার জন্য।"

"ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোকজন জানে ?"

লোকটা হাসলো, "আপনার পিঠে একটা পিঁপড়ে হাঁটলে আপনি জানবেন না।"

অর্জুন বুঝলো লোকটা একেবারে বোকা নয়। আর এখানকার চারপাশের মানুষদের হাতে রেখে দলটা কাজ চালাচ্ছে, এটা বোঝা গেল। এবার লোকটা বললো, "চলুন, আমি আগুন জ্বালিয়ে নিচ্ছি। এখানে কয়েকটা শুকনো ডাল আমি রেখে গিয়েছিলাম—।" ফস করে দেশলাই জ্বাললো লোকটা। একটু খুঁজতেই বেঁটে-বেঁটে কয়েকটা ডাল পেয়ে গেল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাঠি খরচ করে সেগুলো ধরালো, তারপর এগোতে লাগলো।

বাতাসের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। নাকে ডালপোড়া গন্ধ ভেসে আসছে। অর্জুন ছায়ামাখা কাঁপা আলোয় লোকটিকে অনুসরণ করছিল। এবড়োখেবড়ো পথ। কুঁজো হয়ে চলার জন্য কোমরে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। মিনিট তিনেক হাঁটার পর লোকটা দাঁড়ালো। অর্জুন দেখলো সামনে দুটো পথ। সুড়ঙ্গ দু'দিকে চলে গিয়েছে। লোকটা বললো, "ওইদিকে গেলে মন্দিরের গায়ে পেঁছে যাওয়া যায়। এদিকটায় আমি মাল রাখি। আপনি কি এবার আমাকে যেতে দেবেন ?"

"কোথায় যাবে তুমি "

"আমার জিনিস নিয়ে বেরিয়ে যাব।"

"বেরিয়ে যাবে কোথায় ? বাইরে গোলাগুলি চলছে।"

"আমার কিছু হবে না।" লোকটা হাসলো, "আচ্ছা, অপনি কোন্ দলে ?"

"যারা অন্যায় করে তাদের বিরুদ্ধে।"

"তার মানে, পুলিশ ?"

"আমি পুলিশ নই।"

"সেটা অবশ্য আপনাকে দেখেও বোঝা যায়। তা হলে বলি।"

"তোমার ওই পথটা আমি দেখবো।"

"পথ তো বেশি নেই। একটুখানি।" লোকটা ভাবলো খানিক, "শুনুন আপনি যদি আমাকে বাধা দেন তা হলে আমি ছেড়ে দেবো না।"

"আমি কিছুই করছি না।"

"লোকটা এবার বাঁ দিকে এগোলো। তিন-পা যেতেই সুড়ঙ্গ শেষ। সামনে পাথরের পাঁচিল। লোকটা আর একটা ডাল ধরালো। তারপর এক কোণে রাখা একটা বস্তা তুলে নিলো। অর্জুন সেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কী আছে ওর ভেতর ?"

"জিনিস।"

"ক জিনিস ?"

লোকটা অস্বস্তিতে পড়লো। তার এক হাতে মশালের মতো ধরা আগুন, অন্য হাতে বস্তাটা। হঠাৎ বেশ কাতর গলায় বললো, "মাসখানেক আগে এক জোতদারের ঘর থেকে কিছু বাসন চুরি করে এখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। হাওয়া ঠাণ্ডা হতে নিয়ে যাচ্ছি।"

"তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।"

"তারপর ?"

অর্জুন হকচকিয়ে গেল। আগুনের ছোঁয়ায় লোকটির মুখ কেমন রহস্যময়। অর্জুন বললো, "অন্যায় করেছ, তোমার জেল হবে। সেটাই শাস্তি।"

"তারপর ?"

"মানে ?"

"জেল থেকে একদিন ছাড়া পাব। পেয়ে কী করবো ?"

"কাজকর্ম করবে।"

"সেটা পেলে তো এখনই করতাম।" বলে লোকটা সোজা এগিয়ে এলো অর্জুনের দিকে। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুহূর্তেই তৈরি হয়ে গেল অর্জুন, কিন্তু তার গা ঘেঁষে লোকটা নির্বিকার মুখে বেরিয়ে গেল। আলো এবং বস্তা হাতে কুঁজো হয়ে হেঁটে গেল যে দিক দিয়ে তারা এতক্ষণ এসেছিল সেই পথে। লোকটা অন্যায় করছে। কিন্তু অর্জুন ভেবে পেলো না সে কী করতে পারে। ওই অন্যায়ের জন্য গুলি করা যায় না। পেছনে ধাওয়া করে ওকে আটকে যে পুলিশের হাতে তুলে দেবে সেই পরিস্থিতি এখন নেই। কিন্তু একটা লোক যে এমন নির্বিকার মুখে অন্যায় করে যেতে পারে একটুও পাপবোধে পীড়িত না হয়ে, তা একে না দেখলে সে ভাবতে পারতো না। হঠাৎ চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। অর্জুন ফাঁপড়ে পড়লো। লোকটার চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আলো চলে গেছে। তার মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিরশির করে উঠলো। লোকটা তাকে ফাঁদে ফেলে গেল না তো ? অন্ধকার সুড়ঙ্গে রেখে দিয়ে ও সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে চলে

যেতে পারে। নাকে এখনও ডালপোড়া গন্ধ লাগলো। তার মানে অক্সিজেন দ্রুত কমে আসছে। নতুন বাতাস ঢোকার যদি কোনোও পথ না থাকে তা হলে এখানে দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে। অর্জুন দ্রুত লোকটাকে অনুসরণ করতে চাইলো। কিন্তু কয়েক পা যেতেই অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়লো একপাশে। হাতের বন্দুকটা সশব্দে আছাড় খেলো পাথরে। উঠে বসলো সে। হাঁটুতে বেশ চোট লেগেছে পড়ার সময়। তার মাথায় এখন একমাত্র চিন্তা, এই সুড়ঙ্গ থেকে বের হতে হবে। সাপ দূরের কথা, একটা বিছে যদি এই অন্ধকারে তাকে কামড়ায় তা হলেও সে কিছুই দেখতে পাবে না। মিনিটখানেক হাতড়ে-হাতড়ে সে বন্দুকটাকে খুঁজে পেলো। পড়ে যাওয়ার পর এটি কী অবস্থায় আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন স্থির করলো সে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। অতটা পথ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে যাওয়ার কোনোও মানে হয় না। লোকটা বলেছিল তারা সুড়ঙ্গের এই মুখের কাছেই চলে এসেছে আর একটু হাঁটলে মন্দিরের গায়ে পেঁছে যাওয়া যাবে। অন্তত লোকটা সেইরকমই বলেছিল।

বন্দুকটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করলো অর্জুন। এতে পথ চলতে বেশ সুবিধে হচ্ছে। তার বুকে একটা ভয় চাপা ছিলই। যদি সুড়ঙ্গের দুটো মুখই বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে এখানে সারাজীবন যক্ষের মতো বন্দী হয়ে থাকতে হবে। এই ভয়টাই যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে নিয়ে চলেছিল অর্জুনকে। ইতিমধ্যে দু-দু'বার আছাড় খেতে হয়েছে তাকে। মুখে মাকড়সার জাল জাতীয় কিছু জড়িয়েছে। অদ্ভুত এক ধরনের পচা গন্ধ নাকে আসছে। যে লোকগুলো কালাপাহাড়ের সম্পদ অন্বেষণে এখানে এমন পাকা ব্যবস্থা করে জাঁকিয়ে বসেছে তারা যে এই সুড়ঙ্গের সন্ধান এখনও পর্যন্ত পায়নি সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পেলে এইরকম আদিম গন্ধ এখানে থাকতো না। কিন্তু পেলো না কেন এইটে ভাবতে অবাক লাগছে। আছাড় খেয়ে হাঁটুতে বেশ ব্যথা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। অর্জুন খুব ধীর সতর্ক হয়ে হাঁটছিল। এবং হঠাৎ

তার চোখে একফালি আলো স্নিগ্ধতা ছড়ালো। খানিকটা দূরে একটা ফাঁক গলে সুড়ঙ্গের মধ্যে সেই আলো এসে পড়েছে। পায়ের তলায় টুকরো পাথর। সহজভাবে হাঁটা যাচ্ছে না। মাথার ছাদ ক্রমশ আরও নীচে নেমে এসেছে। তারই মধ্যে দ্রুত জায়গাটা অতিক্রম করতে গিয়ে অর্জুন আচমকা পাথর হয়ে গেল। একেবারে কাছ থেকেই ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ আসছে। প্রচণ্ড রেগে যাওয়া সেই প্রাণী সাপ ছাড়া কিছু নয় এটুকু বুঝতে সময় লাগলো না। এই অবস্থায় সামান্য নড়াচড়া মানে সাপটির ছোবল শরীরে নেওয়া। আবার দাঁড়িয়ে থাকলেই যে সাপটি নির্লিপ্ত হয়ে ছেড়ে দেবে এমন ভরসা কোথায়? অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। আলোর ফালি আর দূরে নয়। তাই এখানে অন্ধকার তেমন জমাট বেঁধে নেই। চোখ শব্দ অনুসরণ করতেই বিশাল ফণাটাকে দেখতে অসুবিধে হলো না। সাপটা মাটি ছেড়ে প্রায় সুড়ঙ্গের ছাদ পর্যন্ত ফণা তুলে দুলছে। ছোবল মারার ঠিক আগের ভঙ্গি এটা। মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার মতো দ্রুত কেউ বললো আক্রমণ করো এবং একইসঙ্গে বন্দুক ধরে রাখা হাতটা সচল হলো। ট্রিগার নয়, লাঠির মতোই ব্যবহার করলো অর্জুন এবং সেই একইসঙ্গে সাপটা ছোবল বসালো। বন্দুকের যেখানে তার মুখ ঘষটে গেল তার আধ ইঞ্চি দূরেই অর্জুনের আঙুল ছিল। যত দ্রুতই হোক অর্জুনের আগেই সাপটা দ্রুততম হতে পেরেছিল।

সাপটাকে ছিটকে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিল বন্দুকের আঘাত। সমস্ত শরীরে বরফের কাঁপুনি নিয়ে অর্জুন কয়েকমুহূর্ত অপেক্ষা করলো। ওই আঘাত সামলে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না বলেই বোধ-হয় ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে উবু হয়ে বসলো। তার চোখ সুড়ঙ্গের ভেতর দিকে, এবার বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল। সাপটা যদি এগিয়ে আসতে চায় তা হলে সে সরাসরি গুলি করবে। এখন অনেকখানি

জায়গা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

প্রায় মিনিট তিনেকের অপেক্ষা বিফলে গেল। সাপটার ফিরে আসার কোনোও লক্ষণই দেখা গেল না। অর্জুন এবার সুড়ঙ্গের মুখের দিকে তাকালো। ওপাশে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। সে আলো আসার পথটা ধরে চাপ দিলো। একটুও নড়লো না জায়গাটা। লোকটা বলেছিল মন্দিরের পাশে গিয়ে উঠেছে এই সুড়ঙ্গ। ওপাশে যুদ্ধের ফল কী হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। যদি লোকগুলো জিতে থাকে প্রথম রাউন্ডে, তা হলে শিবমন্দির তো তাদের দখলেই থাকবে। কিন্তু এখানে অনন্তকাল এভাবে বসে থাকা যায় না। বন্দুকের বাঁট দিয়ে আলো আসার পথটাকে আঘাত করতে লাগলো অর্জুন। একটু-একটু করে ফাঁকটা বড় হচ্ছে। অর্জুনের শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। ওপাশে একটা বড় পাথর রয়েছে। সেটাকে কিছুতেই সরানো সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয় দফায় চেষ্টা করার পর যেটুকু ফাঁক হলো তাতে কোনোওমতে বেরিয়ে যাওয়া যায়। ওপাশে কী আছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অর্জুন এগিয়ে যেতেই কানে মানুষের গলা ভেসে এলো। আওয়াজটা আসছে সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে। সে চটপট শরীরটাকে তুলে বাইরে নিয়ে আসতেই পাথরটা নড়ে আবার সুড়ঙ্গের মুখে সরে এসে আটকে গেল। ওঠার সময় ওটি ফিরে এলে আর দেখতে হতো না। এবং তখনই অর্জুনের খেয়াল হলো তার বন্দুক সুড়ঙ্গের মধ্যেই পড়ে আছে।

১৬
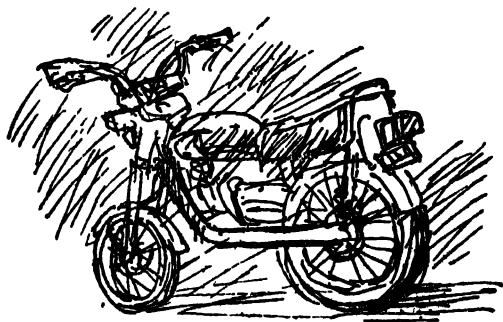
বন্দুকের জন্য আবার সুড়ঙ্গে নামাটা বোকামি হবে। অর্জুন চার-পাশে তাকাতেই মন্দিরটাকে দেখতে পেলো। ডালপালার অজস্র পাতায় চাপা পড়ে গেছে। সেই প্রাচীন মন্দিরের মতোই সরু ইঁটের গাঁথুনি। তার অনেক জায়গায় ভাঙনের চিহ্ন স্পষ্ট। অর্জুন ধীরে-ধীরে এগোলো। কালাপাহাড় যদি এখানে এসে থাকে তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই মন্দির তার হিংসার শিকার হয়নি। কিন্তু কেন?

মন্দিরটি আকৃতিতে খুব বড় নয়। তবে কয়েকশো বছর আগে মূল মন্দির চত্বর কতখানি ছিল সেটা এখন আন্দাজ করা মুশকিল। এখানে ধারেকাছে কোনোও বিল তো দূরের কথা জলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। উত্তরবাংলার এই প্রান্তে বিল দেখা যায় না বললেই চলে। ভৌগোলিক কারণেই সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সেই সময় ছিল

কিনা তাও বোঝা মুশকিল। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা মন্দির আছে এই খবর যখন স্বয়ং ডি. এফ. ও. জানেন না তখন—সব জেনে-শুনে হরিপদ সেনের প্রতিপক্ষের এখানে আসার পেছনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট যুক্তি আছে। মন্দিরের মুখটায় এসে দাঁড়াতেই গুলির শব্দ কানে এলো। সুড়ঙ্গে ঢোকার সময় যেরকম ঘন-ঘন গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল এখন আর সেটা হচ্ছে না। এই প্রায়-বন্ধ-হওয়া আওয়াজ বলে দিচ্ছে ওদিকে যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। আপাতত কোন্ পক্ষ জিতলো সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন দেখলো মন্দিরে কোনো দরজা নেই। ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, কারণ কোনো জানলাও নেই। যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সম্ভবত একসময় বারান্দা ছিল। এখন সেটা মাটির সমান রেখায় নেমে এসেছে। অর্থাৎ পুরো মন্দির-টাই বসে গিয়েছে।

ভেতরে ঢোকার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। কিন্তু একেবারে খালি হাতে প্রায় অন্ধকার প্রাচীন ঘরে ঢুকতে সাহসও হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা গাছের মোটা ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে নিলো সে। ওটাকে মেঝেতে ঠুকে আওয়াজ করতে-করতে মন্দিরের মুখটায় দাঁড়াতেই অনেকখানি চোখে পড়লো। সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকেই সে চারপাশে তাকিয়ে নিলো। না, কোনো মানুষ অথবা জন্তু এখানে নেই। বরং মেঝেটা বেশ পরিষ্কার করা। এরকম বন্ধ জায়গায় একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ থাকা স্বাভাবিক ছিল যেটা একেবারেই নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়লো মেঝেতে কিছু চিকচিক করছে। কয়েক পা হেঁটে সেটি কুড়িয়ে নিতেই স্পষ্ট হলো এখানে নিয়মিত লোকজন আসে। নইলে বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট এখানে পড়ে থাকতো না। হরিপদ সেনের প্রতিপক্ষ কি এই মন্দিরটাকে থাকার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করতো? তা হলে তো অন্যান্য অনেক কিছুই চোখে পড়তো। অর্জুন ভালো করে ঘুরে-ঘুরে ঘরটাকে দেখলো। হাঁটার সময় লাঠিটাকে নিজের অজান্তে মেঝেতে ঠুকছিল। হঠাৎ কানে আওয়াজ যেতেই

সে চমকে মুখ নামালো। শব্দটা অন্যরকম লাগছে। খুব জোরে ঠুকতেই মেঝেটা নড়ে গেল। অর্জুন উবু হয়ে বসে আবিষ্কার করলো হাত দুয়েক চওড়া একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম মেঝেতে সেঁটে রাখা হয়েছে। তার ডান কোণে চাপ না পড়লে ওটা কিছুতেই নড়বে না। সে ধীরে-ধীরে চাপ দিতে লাগলো। চাপ যত বাড়ছে তত বিপরীত দিকের প্ল্যাটফর্ম ওপরে উঠে আসছে। ওটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে গর্তটা চোখে পড়লো ভালোভাবে।

একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নীচে। সিঁড়ির চেহারাটা সম্পূর্ণ নতুন। ঠিক এই সময় মন্দিরের গায়েই গুলির আওয়াজ হলো। চমকে উঠলো অর্জুন। প্ল্যাটফর্মটা কোনোও মতে বন্ধ করেই সে এক লাফে মন্দিরের অন্ধকার কোণে গিয়ে দাঁড়ালো লাঠিটাকে শক্ত মুঠোয় ধরে।

লোকটা ছিটকে মন্দিরে ঢুকলো। তাড়া খাওয়া বাঘের মতো দেখাচ্ছিল তাকে। ডান হাতের রিভলবার দরজার দিকে তাক করে সে ধীরে-ধীরে ঘরের ভেতর এগোচ্ছিল। অর্জুন দেখলো এর সমস্ত মনোযোগে বাইরের শত্রু আছে। দরজাটাকে খেয়াল রেখে লোকটা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের বাইরে কারও ছায়া দেখেই লোকটা একটা গুলি ছুঁড়লো। ইতিমধ্যে সে প্ল্যাটফর্মের বাঁ দিকে পেঁছে গিয়েছে! জুতো দিয়ে আঘাত করলো সে ঠিক সেই জায়গায়, সেখানে চাপ পড়লে প্ল্যাটফর্ম সোজা হয়। আর সময় নষ্ট না করে লোকটা সিঁড়িতে পা দিলো। নামবার সময় একটু বেকায়দায় নামতে হচ্ছে কিন্তু দরজা থেকে চোখ আর রিভলবার সরাচ্ছে না। অর্জুন লোকটার শরীরকে নীচে নেমে যেতে দেখছিল। হঠাৎ তার ইন্দ্রিয় সজাগ হতেই সে বিদ্যুতের মতো দেওয়াল ছেড়ে এগিয়ে এসে লোকটার কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত করলো। লোকটির কাঁধ তখন মেঝে থেকে সামান্যই উঁচুতে ছিল। আঘাত লাগা মাত্র তার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। সেই সময়ের মধ্যেই

দ্বিতীয়বার আঘাত করলো অর্জুন। উত্তেজনায় এবারের আঘাত কাঁধের নীচে পড়তেই লোকটা আচমকা এগিয়ে গেল। তার হাত প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়তেই সেটা চট করে নীচে নেমে এসে মাথায় আঘাত করলো। লোকটার শরীর এখন সিঁড়ি এবং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আটকে গেছে। অর্জুন রিভলবারটা তুলে নিলো। প্ল্যাটফর্ম-টাকে এক হাতে সোজা করতেই বোঝা গেল লোকটা এখন অজ্ঞান হয়ে আছে। ওকে টেনে ওপরে তোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এসে এপাশের দেওয়ালে লাগলো। অর্জুন তড়াক করে লাফিয়ে আবার উল্টো দিকের দেওয়ালে চলে গেল। এই গুলি কারা ছুঁড়ছে? লোকটা যখন প্রতিপক্ষ এবং তার উদ্দেশ্যেই গুলি ছোঁড়া হচ্ছে তখন চিৎকার করে জানান দেওয়া দরকার। ভুল করে ওরা তাকেই গুলি করতে পারে। সাধারণ সেপাইরা তো এই অবস্থায় তাকে চিনতে পারবে না। হঠাৎ ঠক করে আওয়াজ হতেই অর্জুন দেখলো প্ল্যাটফর্মটা নীচে নেমে আগের মতো বসে গেছে। না জানা থাকলে ওটাকে আর আলাদা করে চেনা মুশকিল। তার মানে লোকটা এরই মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে পালিয়েছে। ,

অর্জুন চিৎকার করলো, "গুলি ছুঁড়ো না। আমি অর্জুন।"

বাইরে থেকে কোনো সাড়া এলো না। চারধারে এখন নিস্তব্ধ।

কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, যারা বাইরে বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে তারা দেখামাত্রই গুলি করবে।এস. ডি. পি. এফ. ও., ভানুদা অথবা অমল সোম না আসা পর্যন্ত সে চট করে ওদের বোঝাতে পারবে না।অর্জুন প্ল্যাটফর্মটার দিকে তাকালো। সুড়ঙ্গ কোথায় আর এই প্ল্যাটফর্ম কোথায়! নাকি দুটোর মধ্যে সংযোগ রয়েছে? সে বুঝতে পারছিল না কী করবে।লোকটা যদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেই সুড়ঙ্গ-টাকে পেয়ে যায় তা হলে ধরা মুশকিল হবে। তার মনে পড়লো সুড়ঙ্গ থেকে উঠে আসার সময় ভেতরে কিছু মানুষের গলার স্বর

শুনতে পেয়েছিল।

"ভেতরে যিনি আছেন বেরিয়ে আসুন, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।" চিৎকার ভেসে আসতেই অর্জুন স্বস্তি পেলো। সে সমানে গলা তুলে বললো, "আমি অর্জুন। গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করুন।"

কথাগুলো শেষ হওয়ামাত্র পায়ের শব্দ হলো। অর্জুন এস. পি. সাহেবের মুখ দেখতে পেলো, পেছনে বন্দুক হাতে সেপাইরা। এস. পি. বললেন, "মাই গড। এখানে কী করছেন?"

"আর কী করবো? আপনার সেপাইরা যেভাবে গুলি ছুঁড়ছেন যে পেছোতে পারছি না।"

"তা আপনি যদি ওদের আক্রমণ করে এখানে পালিয়ে আসেন তা হলে ওরা ছেড়ে দেবে কেন? ইট্স নট ডান। ওদের দেখে ভুল হওয়ার কথা নয়।"

"আমি ওদের দেখে গুলি ছুঁড়িনি।"

"মিথ্যে কথা বলছেন। ওরা সবাই আমাকে জানিয়েছে, যে গুলি ছুঁড়ছিল সে ওই মন্দিরের ভেতর এসে লুকিয়েছে।" এস. পি. চার-পাশে তাকালেন, "এখানে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। যেসব উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটছে তাতে কারোও ওপর বিশ্বাস রাখা মুশ-কিল। আপনাকে এক উপযুক্ত কৈফিয়ত দিতে হবে।"

অর্জুনের হাসি পাচ্ছিলো। সে বললো, "ওদের জিজ্ঞেস করুন আমাকে মন্দিরে ঢুকতে দেখেছে কি না! তোমরা কি আমাকে দেখেছ?"

সে নিজেই প্রশ্নটা করলো। সেপাইরা একটু থতমত খেলো। দু-জন বললো দেখেছে, দুজন জানায় বুঝতে পারছে না। অর্জুন কিছু-করার আগে বাইরে কথাবার্তা শোনা গেল। সে ডি. এফ. ও. সাহেবের গলা পেলো, "আজব ব্যাপার! এখানে এরকম মন্দির আছে তা আমাকে কেউ জানায়নি! এত বড় ষড়যন্ত্র চলছিল এখানে। এস. পি. সাহেব কোথায়?"

এস. পি. মন্দির থেকে বেরোতেই অর্জুন তাকে অনুসরণ করলো। এস. পি-র দেখা পাওয়া মাত্র ডি. এফ. ও. বলে উঠলেন, "আমার ডিপার্টমেণ্টের যারা ওদের সাহায্য করেছে বলে প্রমাণ পাচ্ছেন তাদের স্বচ্ছন্দে গ্রেপ্তার করতে পারেন।"

"সরাসরি প্রমাণ পাওয়া খুব মুশকিল, তবে দু'জনকে ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই করা গেছে আর তৃতীয়জন হলেন ইনি। অবশ্য আপনার ডিপার্টমেণ্টের লোক নন।" আঙুল তুলে অর্জুনকে দেখালেন এস. পি., "আমার লোকের ওপর গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে এই মন্দিরের ভেতরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।"

হঠাৎ ভানু ব্যানার্জি'র গলা শোনা গেল, "অসম্ভব, মিথ্যে কথা। অর্জুন এমন কাজ করতেই পারে না। আপনি ভুল বলছেন।"

এস. পি. হাসলেন, "আমার সেপাইদের জিজ্ঞেস করুন।"

ভানু ব্যানার্জি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন অমনি অর্জুন হাত তুলে বাধা দিলো। সে এবার সেপাইদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, "যে লোকটা তোমাদের ওপর গুলি ছুঁড়ে এই মন্দিরে ঢুকেছে তার চেহারার সঙ্গে আমার কোনো মিল আছে ?"

একজন সেপাই বললো, "ভালো করে লোকটাকে দেখার সুযোগ পাইনি আমি।"

"লোকটার পোশাক দেখেছ ?"

"হ্যাঁ। শার্ট-প্যাণ্ট।"

অর্জুন দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করতে সে জানালো, "কোট-প্যাণ্ট।"

অর্জুন এবার এস. পি-র দিকে তাকালো, "বুঝতে পারছেন, উত্তেজনার সময় ওরা কী লক্ষ্য করেছে। ওই মন্দিরে আমি আগেই ঢুকেছিলাম। ওরা যাকে দেখেছে সে পরে ঢুকেছিল।"

এস. পি. বললেন, "ওয়েল। তা হলে লোকটা গেল কোথায় ? এরা বলছে কেউ মন্দির থেকে বের হয়নি। আর কোনো দরজা নেই মন্দিরের যে, বেরিয়ে যেতে পারে। আর ওরকম একটা খুনি আপ-

নাকে দেখে ছেড়ে দিলো! বিশ্বাস করতে বলেন? তা ছাড়া, ওই রিভলবারটা আপনি কোথায় পেলেন ? এখানে যখন এসেছিলেন তখন কি ওটা আপনার সঙ্গে ছিল।"

ডি. এফ. ও. বললেন, "কারেক্ট। আসার সময় আপনি বারংবার বলছিলেন খালি হাতে আসাটা ঠিক হচ্ছে না।"

অর্জুন এক মুহূর্ত ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "মিস্টার সোম কোথায় ?"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "মিস্টার সোমকে আমরা দেখতে পাইনি।"

"এদিকের অবস্থা কী ?"

"এরা সবাই অ্যারেস্টেড। শুধু চাঁইদের ধরা যায়নি।"

অর্জুন বললো, "এস. পি. সাহেব, কাল রাত্রে এদের কার্যকলাপ আবিষ্কার করার পর আমি আপনাদের সমস্ত ব্যাপার জানাই। যদি আমিই আপনার লোকের ওপর গুলি ছুঁড়বো তা হলে সেটা করবো কেন ?"

"প্রশ্নটা তো আপনাকেই করছি।" এস. পি. খুব কায়দা করে হাসলেন।

"উত্তরটা দেওয়ার আগে আমার কথামতো কাজ করুন।" অর্জুন মন্দিরের ভেতরে দলটা নিয়ে এলো, "দু'জন সেপাইকে এখানে পোস্ট করুন। এটা একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম। খুললে নীচে যাওয়া যায়। যদি কেউ এখান দিয়ে বেরোতে চায় তাকে অ্যারেস্ট করতে অসুবিধা হবে না।" অর্জুন দেখিয়ে দেওয়ামাত্র এস. পি. প্ল্যাটফর্ম তোলার চেষ্টা করলেন কিন্তু ঠিক জায়গায় চাপ না পড়ায় সেটা উঠলো না।

ভানু ব্যানার্জি বলে উঠলেন, "লোকটা কি এখান দিয়েই পালিয়ে গেছে ?"

অর্জুন মাথা নাড়লো, "হ্যাঁ। আমাকে দেখতে পায়নি। পেছন থেকে ওকে আমি আঘাত করেছিলাম। পালাবার আগে রিভলবারটা পড়ে

গিয়েছিল।"

এস. পি. খুব উত্তেজিত, "তাই বলুন। চলুন এটা খোলা যাক।"

অর্জুন বাধা দিলো, "না। আসুন আমার সঙ্গে।"

সে দলটাকে নিয়ে এলো যে-পথে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেইখানে। পাথরটা এখনও সুড়ঙ্গের মুখ আড়াল করে রেখেছে। অর্জুন বললো, "দু'জনকে এখানে পোস্ট করুন। এটাও বেরোবার একটা মুখ। আমাদের এবার যেতে হবে মূল মুখটায়"

এস. পি. তৎক্ষণাৎ চারজন সেপাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দু'জায়গায় পাহারা দিতে আদেশ করলেন। অর্জুন মনে করার চেষ্ট করছিল ঠিক্ কোন্ জায়গা থেকে সে আদিবাসী লোকটিকে অনুসরণ করে সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল। মাটির ভেতরটা ছিল অন্ধকারে ঢাকা। তার সঙ্গে ওপরের প্রকৃতির কোনো মিল নেই। জায়গাটা চিনতে তার অসুবিধা হচ্ছিল।

মিনিট কুড়ি ঘোরাঘুরি করে অর্জুন ঠাওর করতে পারলো। সে এস. পি.কে বললো, "যদি এর মধ্যে ওরা বেরিয়ে না গিয়ে থাকে তা হলে তৃতীয় মুখটায় আমরা পেঁৗছে গিয়েছি।"

ওরা জঙ্গল সরিয়ে এগোতেই শিসের আওয়াজ শুনতে পেলো। এই শিস অর্জুনের চেনা। সে পাল্টা শিস দিলো। একটু বাদেই অমল সোম বেরিয়ে এলেন জঙ্গলের আড়াল থেকে। তাঁর পেছনে সেই আদিবাসী লোকটি। অর্জুনকে দেখে মুখ নিচু করলো সে।

এস. পি. উত্তেজিত হলেন, "আপনি এখানে ? আর আপনাকে খুঁজছি আমরা।"

"কেন ? কোনো জরুরি দরকার ছিল ?" অমল সোম স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইলেন।

"আশ্চর্য। আমরা এদের গ্রেফতার করতে এসেছি, তাই না ?"

"ঠিকই। সেটা তো করা হয়ে গেছে। অর্জুন, তুমি কি অন্য মুখ-গুলো বন্ধ করেছ ?

"হ্যাঁ। দুটো মুখে লোক রাখা হয়েছে।"

"ভালো। আশা করবো চতুর্থ মুখ নেই।"

ডি. এফ. ও. বলে উঠলেন, "মানে ?"

"কার্বঙ্কলের মতো ব্যাপার হলে আরও মুখ থাকতো। এদিকটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। এস. পি. সাহেব, এখন আপনার আসল অপরাধীরা মাটির তলায়।"

অমল সোম হাসলেন, "এবার ওদের বের করতে হবে।"

অর্জুন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে জানতে চাইলো "অমলদা, আপনি কখন সুড়ঙ্গের হদিস পেলেন ?"

"তুমি যখন এর সঙ্গে ঢুকলে তখনই। তারপর এ একা বেরিয়ে এলো এবং তিনজন মানুষ ভেতরে ঢুকে গেল পড়ি কি মরি করে। আমি তখন এই লোকটির সঙ্গে ভাব জমালাম। খুবই সাধারণ ব্যাপার।"

"সুড়ঙ্গটা কত বড় ?" এস. পি. জানতে চাইলেন।

"অর্জুন বলতে পারবে।" অমলদা অর্জুনের দিকে তাকালেন।

অর্জুন জবাব দিলো, "অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে বেশ বড়।"

"এরকম একটা গোপন আস্তানা ওরা তৈরি করে রেখেছে আমি ভাবতে পারছি না।"

"তৈরি তো এখন হয়নি। কালাপাহাড় করেছিলেন। কয়েকশো বছর হয়ে গেল। কিন্তু ওদের বের করতে হবে। ওহে, তোমরা কী করে গর্ত থেকে খরগোশ ধরো ?"

অমল সোম লোকটিকে জিজ্ঞেস করতে সে জানালো ধোঁয়া দিয়ে কাজটা করে তারা। অমল সোম হাসলেন, "বাঃ। সরল ব্যাপার। অর্জুন, আমি তোমাকে গোড়া থেকেই বলে এসেছি এই কেস খুব সরল। নিন, আপনারা ধোঁয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এই লোকটি সুড়ঙ্গের মুখ দেখিয়ে দেবে। ততক্ষণে আমরা একটু চারপাশে ঘুরে আসি। এসো অর্জুন, আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।" অমলদা পা চালালেন।

১৭
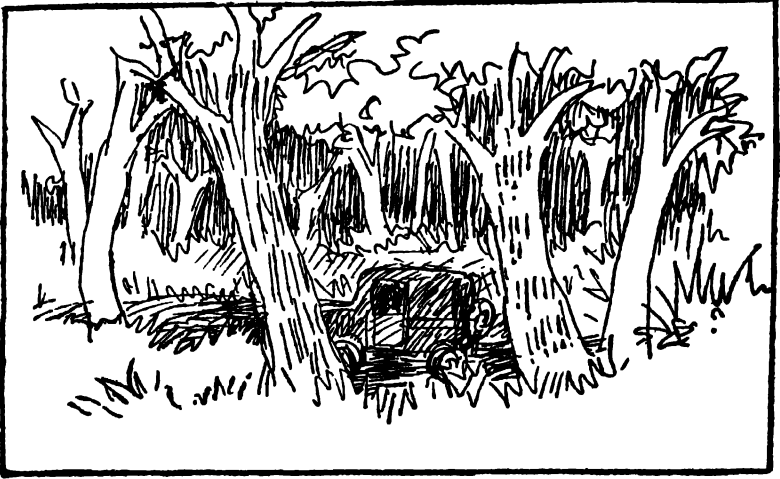
অমল সোমের সঙ্গে এতদিন ঘনিষ্ঠভাবে থেকেও তাঁর অনেক আচরণের ঠিকঠাক ব্যাখ্যা অর্জুন এখনও পায়নি। এই মুহূর্তে সেটাই মনে হলো। লোকগুলোকে ধরার ব্যাপারে আর কৌতূহলই যেন নেই তাঁর। এস. পি. সাহেবরা কাজে লেগে গেলেন। অর্জুন আর ভানু ব্যানার্জি অমল সোমকে অনুসরণ করলো।

সেই বিশাল খাদ, যেটা গতরাতে অর্জুন দেখে গিয়েছিল, তার পাশে এসে দাঁড়ালো ওরা। কিছু সেপাই জনাদশ-বারো লোককে একটা জায়গায় দড়ি দিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিনটে মৃতদেহ চোখে পড়লো। অর্জুনের মনে হলো এদের দু'জনকে গতরাতে সে দেখেছে। খাদটা, যেটা খোঁড়া হয়েছে, সেটা মন্দিরের কাছেই। অমল সোম সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "অর্জুন, এতবড় একটা কর্মকাণ্ড এখানে দিনের পর দিন চলেছে, আর কর্তারা কেউ খবর পেলেন না,

এদেশেই এটা সম্ভব। কিন্তু লোকটির বুদ্ধি আছে।"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গার খোঁজ এরা পেলো কী করে?"

"পেয়েছে তো দেখতে পাচ্ছি। হরিপদ সেন যেটা জানতেন না এরা তা জানতো। কিন্তু মন্দির থেকে এতদূরে কেন? সুড়ঙ্গের কথা ওরা জানতো। মন্দিরের গায়েই সুড়ঙ্গ। কালাপাহাড় নিশ্চয়ই। সুড়ঙ্গের ভেতরেই সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তা হলে এখানে খাদ খোঁড়া কেন?" অমল সোম যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

অর্জুন বললো, "এখানে কোনো বিল নেই অমলদা।"

"সেটাও রহস্য। কিন্তু ওরা জায়গা নির্বাচন করতে ভুল করেছে এটা কিন্তু মানতে পারছি না।"

অমল সোম খাদের মধ্যে নেমে গেলেন। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে এসে বললেন, "ধারণাটা ঠিক। এখানে একসময় জল ছিল। মাটির এত নীচে গুগলি আর শামুক চাপা পড়ে সচরাচর থাকে না। তোমার কি ধারণা ওরা গুপ্তধন পেয়ে গেছে?"

অর্জুন বললো, "ওরা আজই এখান থেকে পাততাড়ি গোটাবার কথা ভেবেছিল। আগামীকাল কাউকেই পাওয়া যেত না। তার মানে ওরা কাজ শেষ করেছিল।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "কাজ শেষ হয়ে গেলে এখানে পড়ে থাকার লোক এরা নয়। খোদ কর্তা ওগুলো নিয়ে আগে হাওয়া হয়ে যেতেন। চলো, মন্দিরের ভেতরে যাই।" অমল সোম এগোতে লাগলেন। দূরে জঙ্গলের মাথায় ধোঁয়া দেখা গেল। ওরা মন্দিরের ভেতর ঢুকে সেপাইদের দেখতে পেলো। পাহারা দিচ্ছে।

অমল সোম মন্দিরের ইট পরীক্ষা করলেন, "কালাপাহাড় নবদ্বীপের মন্দির স্পর্শ করেননি। এটির প্রতি অনুগ্রহ হলো কেন তাঁর? কোচবিহারের রাজাকে হারিয়ে এখানে এসে—, উঁহু, কেমন যেন হিসাব মিলছে না। তিনি কি নন্দলাল সেনের অনুরোধ রেখেছিলেন?

অবশ্য হতে পারে। মন্দির গুঁড়িয়ে দিলে সম্পদ লুকিয়ে রাখার যায়গাটা পরে চেনা যাবে না, তাই— ।"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "যে-লোক অমন ছিল সে কেন মন্দিরের গায়ে সম্পদ লুকোতে যাবে ?"

অমল সোম বললেন, "মানুষটি বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি জানতেন কেউ ভাবতেও পারবে না অত সম্পদ মন্দিরের গায়ে কালাপাহাড় রেখে যেতে পারে। এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে কিছু যদি থেকে থাকে তা হলে ওই সুড়ঙ্গেই আছে।"

অমল সোম কথা শেষ করা মাত্র কাঠের প্ল্যাটফর্মে শব্দ হলো। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হয়ে দাঁড়ালো। প্ল্যাটফর্মটা ধীরে-ধীরে ঘুরছে। গর্তটা চোখে পড়লো। তারপর একটা হাত, মাথা সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেপাইরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। টেনে-হিঁচড়ে তাকে বাইরে বের করে আনা মাত্র নীচে থেকে গলা ভেসে এলো, "কী হলো শরৎ? এনি প্রব্লেম ?"

শরৎ নামের লোকটাকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছিল। নীচে থেকে কাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। লোকটা আর থাকতে পারছিল না। অর্জুন এখানে দাঁড়িয়েই ধোঁয়ার গন্ধ পেলো। মিনিট তিনেকের মধ্যেই আরও একজন বন্দী হলো। ওদের মন্দিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। ভানু ব্যানার্জি এবং সেপাইরা তৃতীয়জনের অপেক্ষায় রইলেন।

বন্দী দু'জনের দিকে তাকিয়ে মনে হলো এরা বেশ দুধে-ভাতে ছিলেন। হাত বেঁধে মাটিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওঁদের। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মধ্যে কার উপাধি সেন ?"

লোক দুটো নিজেদের দিকে তাকালো। অর্জুন দেখলো যে-লোকটিকে সে আঘাত করেছিল সে এদেরই একজন। অমল সোম ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "জবাব দিন।"

"আমরা কেউ সেন নই।" একজন উত্তর দিলো।

"সেন কোথায় ?"

"নীচে।"

"আপনারা ওঁর পার্টনার ?"

"হ্যাঁ।"

"সম্পত্তি পেয়েছেন ?"

"না।"

"সে কী ! এতো খোঁড়াখুঁড়ি, খুনোখুনি— ।"

লোক দুটো চুপ করে রইলো। অমল সোম বললেন, "চুপ করে থেকে কোনো লাভ হবে না। আপনারা একের-পর-এক খুন করেছেন এখানে। জায়গাটা আদিম করে তুলেছিলেন। এস. পি. সাহেব ঠিক সেই কাজটা করতে পারেন। কালাপাহাড়ের সম্পত্তি কোথায় ?"

একজন বললো, "নিরাপদ জায়গাটা ঠিক বেছেছিল, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।"

"নিরাপদ কে ? যিনি মাটির নীচে আছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারা শিলিগুড়িতে যাওয়ার সময় আমাদের লিফট্ দিয়েছিলেন মনে পড়ছে ? গুড। হরিপদ সেনকে খুন করে কে ?"

"আমি জানি না।"

"বাজে কথা, বিশ্বাস করি না।"

"আমরা যাওয়ার আগে খুন হয়েছিল হরিপদ সেন।"

"নিরাপদ সেন কোথায় ছিল তখন ?"

"শিলিগুড়িতে।"

"সে আপনাদের কিছু বলেনি ?"

"না। তবে হরিপদ খুব বাগড়া দিচ্ছিল, অথচ ওর কোনো রাইট নেই কালাপাহাড়ের সম্পত্তির ওপর। সেটা আছে নিরাপদর।"

"কেন ? হরিপদর দাদু তাঁকে অধিকার দিয়েছেন।"

"মিথ্যে কথা। হরিপদর যিনি দাদু তিনি নিরাপদরও দাদু। তিনি

আমাদের এই জায়গার কথা বলেন, হরিপদকে বলেননি।"
"আপনারা বলছেন এই জায়গার কথা তিনি জানতেন?"
"হ্যাঁ। কারণ তিনি নিজে এসে কয়েকবার খুঁজে গিয়েছেন, পাননি। ওঁর বাবাও এসেছিলেন। নন্দলাল সেনের প্রতিটি বংশধর এসে ফিরে গিয়েছে বিফল হয়ে। এবার আমরা তাই তৈরি হয়ে এসেছিলাম।"
"আপনারা কিছু পাননি?"
"না। কারণ কিছুই ছিল না এখানে।"
"মানে?"
'গতরাতে আমরা আবিষ্কার করি সম্পদ এখানে নেই! দশটা লোহার বাক্স পাওয়া গিয়েছে ওই খাদে। ভাঙাচোরা, মাটিতে পোঁতা ছিল কয়েকটা বছর ধরে। নিরাপদর ঠাকুরদা লোহার বাক্সের কথা বলেছিলেন।"
"কে নিয়েছে সম্পদগুলো?"
"নিরাপদ বলছে স্বয়ং কালাপাহাড় নিয়ে গেছে। পুরীতে নন্দলাল সেন উধাও হয়ে যাওয়ার পর লোকটা বোধহয় সন্দেহ করেছিল।"
"এর কোনো প্রমাণ আছে?"
"না, নেই। তবে লোহার বাক্সগুলো দেখলে বোঝা যায় ওগুলো কয়েকশো বছর মাটির নীচে পোঁতা ছিল।"
"ওই জায়গাটা আপনারা খুঁড়লেন কী করে?"
"কাগজে লেখা ছিল, দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল, শিবমন্দির, মন্দির থেকে কুড়ি হাত দূরে বিলের ভেতরে ডুবতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে আমরা কোথায় বিল ছিল জেনেছি।"
অমল সোম অর্জুনের দিকে তাকালেন। হরিপদ সেন যে-কাগজ দিয়েছিলেন তাতে শেষ লাইনটা ছিল না। অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "হৈমন্তীপুর বাগানে এমন ত্রাস কেন সৃষ্টি করলেন। এত খুন কেন করতে হলো?"

"ওটা নিরাপদর প্ল্যান। ও বাগানটাকে কিনতে চেয়েছিল কাজের সুবিধা হবে বলে। মিসেস দত্ত বিক্রি করতে চাননি। বাগান চালু থাকলে এত নিঃশব্দে কাজ করা যেত না। কিন্তু কোনো লাভ হলো না।" লোকটা নিশ্বাস ফেললো।

আপনার নাম কী ?"

"শরৎচন্দ্র রায়।"

"আপনার ?"

"গৌরাঙ্গ দাস।"

"নিবাস ?"

"পুরী।"

ঠিক এই সময় মন্দিরের ভেতরের সেপাইরা চিৎকার করে উঠলো। অর্জুন ছুটলো। আর তারপরেই গুলির শব্দ। মন্দিরে ঢুকে অর্জুন দেখলো, প্ল্যাটফর্মটা খাড়া হয়ে আছে আর সেখান থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সেপাইরা নাক চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল একজন নীচ থেকে ওপরে আসতে চাইছিল। কিন্তু চিৎকার করতেই সে আবার নীচে নেমে গিয়েছে এবং তারপরেই গুলির শব্দটা ভেসে আসে।

ঘণ্টাখানেক বাদে ধোঁওয়া বন্ধ হলে সেপাইরা নিরাপদ সেনের মৃত-দেহ নীচে থেকে তুলে নিয়ে এলো। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত চেহারা। নিজের মাথায় নিজেই গুলি করেছেন তিনি।

অমল সোম আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। নদী পার হয়ে গেলে বেশি হাঁটতে হবে বলে আবার জঙ্গল-পথ ধরতে চাইলেন। কিন্তু ভানু ব্যানার্জি কষ্টটা করতে দিলেন না। তিনি এর মধ্যে নিরাপদের জিপ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। জঙ্গলের আড়ালে সেটা লুকনো ছিল। ডি.এফ.ও. এবং এস. পি. সাহেব বন্দী এবং মৃতদের ব্যবস্থা করতে থেকে গেলেন পেছনে।

সুভাষিণী চা-বাগানে যাওয়ার পথে জিপটা চালাচ্ছিলেন ভানু

ব্যানার্জি। অমল সোম চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। হঠাৎ ভানু ব্যানার্জি বলে উঠলেন, "এত করে কী লাভ হলো ?"

চোখ বন্ধ অবস্থায় অমল সোম বললেন, "যারা করে তারা এটা বুঝতে চায় না। এটাই ঘটনা। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করলো, "কী ?"

"হরিপদ সেন আমাকেও বিশ্বাস করেননি। উনি চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছিলেন। আসল বাটপাড়ি কে করেছে বুঝতে পারছো ?"

ভানু ব্যানার্জি বললেন, "নিরাপদ সেন ?'

"না। কালাপাহাড়। লোকটা কাউকেই বিশ্বাস করতো না। এই বেচারারা কয়েকশো বছর ধরে সেটাই বুঝতে পারেনি।" অমল সোম আবার চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ। অর্জুন দেখলো নীলগিরির জঙ্গল ক্রমশ পেছনে চলে যাচ্ছে।

শেষ